আনন্দমেলা

রেক্সোনা আপনার ত্বকের যত্ন নেয়...

ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ—
কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ। রেক্সোনা মেখে স্নান করুন— এ আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল। অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে রাখে আপনার প্রিয় সুরভি...আপনার ত্বকের যত্ন নেবার স্বাভাবিক উপায়!

রেক্সোনা আপনার ত্বকের পক্ষে ভালো

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RX.78-1812 BC

আনন্দমেলা

১৬ অগ্রহায়ণ ১৩৮৮ • ২ ডিসেম্বর ১৯৮১ • ৭ বর্ষ • ১৭ সংখ্যা

ভ্রমণকাহিনী
শিল্পের শহর । শঙ্করলাল ভট্টাচার্য ৪

গল্প
মোচার ঘন্ট । বাণী বসু ১০
টুপুরের গবেষণা । বিমান রাউত ৩৬
আধখানা ভূত । সুনীল জানা ৫২

উপন্যাস
সিসের আঙটি । বিমল কর ১৮
হারানো কাকাতুয়া । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৪৮

স্মৃতিকথা
বসুবাড়ি । শিশিরকুমার বসু ২২

ছড়া
রাজা-উজির । কাজি মুরশিদুল আরেফিন ২৭
জোড়া মাস্টারি । বিশ্বরূপ মণ্ডল ২৭

খেলোয়াড়ের আত্মকথা
উইং থেকে গোল । পি. কে. ৫৭

চিত্রকাহিনী ও কমিক্স
সদাশিব ২৮, রোভার্সের রয় ৩০,
টিনটিন ৩২, টারজান ৬০, গাবলু ৬১, ৬৪, বাঘা ৬৫

লেখাপড়া
বাংলা বলো । বাচস্পতি ৬২
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৬৩

খেলাধুলো
রান চাই, আরও রান । পল্লব বসুমল্লিক ৪১
ইস্টবেঙ্গলের বাহাদুরি । বঙ্গসেন ৪৩
ইস্টবেঙ্গলের দুঃস্বপ্ন । রঞ্জিতকুমার ঘোষ ৪৬
সুনীল গাভাসকারের পুরোপাতা রঙিন ছবি ৪১

অন্যান্য আকর্ষণ
ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪, তোমাদের পাতা ৩৯
ছবির মজা ৪৭, আঁকো-শেখো ৬৬

প্রচ্ছদ : রতন সেন

সম্পাদক ঃ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাণপাদিতা রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত । দাম দু' টাকা

বিমান মাশুল ঃ ত্রিপুরা ৫ পয়সা । পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা।

সর্দিতে একটি দিনও বৃথা না যায়

সর্দির কষ্ট থেকে আরাম পাওয়া যায়
সর্দির যে সব লক্ষণ সুন্দর দিনগুলোকে একেবারে মাটি করে দেয়, যেমন—নাক থেকে জল পড়া বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, মাথা ভার, গলা খারাপ, বুকে সর্দি বসা—তা থেকে আরাম পাবার উপায় আছে।

সর্দির বিশেষ ওষুধ দিয়ে সর্দি থামান
যেকোনো অসুখের মত চিকিৎসা করলেই যথেষ্ট নয়। সর্দির বিশেষ ওষুধ ব্যবহার করুন যা একই সঙ্গে শরীরের সমস্ত আক্রান্ত অংশে কাজ করে।

কোল্ডরিন শুধু সর্দির জন্যেই
কোল্ডরিন সর্দির যাবতীয় কষ্টকর লক্ষণ থেকে আরাম দেয়। এর বিশেষ উপাদানগুলি সর্দিতে আক্রান্ত সমস্ত অংশে একই সঙ্গে কাজ করে। তাছাড়া, এতে যে ভিটামিন 'সি' আছে তা আপনাকে সর্দি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা যোগায়। সর্দি হলে, তার চিকিৎসা সর্দির বিশেষ ওষুধ দিয়েই তো করা উচিত!

কোল্ডরিন
সর্দির জন্যে সর্দির বিশেষ ওষুধ

CASBC-64-192 BN

শিল্পের শহর

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

এক বসন্তকালের দুপুরে পুরো পাঁচ ঘণ্টা বসে ছিলাম ফ্লোরেন্সের পিয়াজ্জালে মিকেলাঞ্জেলোতে। শহরের এক পাশে একটা পাহাড়ের চুড়োয় এই চক। চারিদিকে ছড়িয়ে আছে ফ্লোরেন্স নগর, তার মধ্যিখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আর্নো নদী, সে-নদীর ওপর অসংখ্য ব্রিজ, নগরের বিভিন্ন এলাকায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য মধ্যযুগীয় টাওয়ার, ইমারত ও চার্চ। নগরকে আরও বাইরে থেকে ঘিরে আছে কত সুন্দর-সুন্দর সব পাহাড়। আকাশের নীল আভায় সেই পাহাড়ের নীল আর নগরের মিঠে ইঁট-রং মিলেমিশে একটা রঙিন মায়াজাল, একটু চোখ চালিয়ে সুদূরে তাকালে অপরূপ ফিয়েসোলে, এবং চোখ নদীর জলে ফেললে পরিষ্কার নীল আকাশের মধ্যাঞ্চলে দাঁড়ানো সূর্যের রশ্মির প্রতিবিম্বিত বর্ণালি। এই পরিবেশে বসে আমি অক্লান্তভাবে সেদিন একটা দুপুর এবং একটা সূর্যাস্তের রূপ দেখেছি। পাহাড়ের ওপর থেকে দেখলে বোঝা যাবে না যে, ফ্লোরেন্স রেনেসাঁসের আমলের বাইরে এক পাও হেঁটেছে। পাহাড়ের চুড়ো থেকে ফ্লোরেন্স এখনও মহাকবি দান্তে, বিজ্ঞানী গালিলেও এবং শিল্পী মিকেলাঞ্জেলো কিংবা জিয়ত্তোর শহর। নীচে আর্নোর দিকে তাকালে মনে হয় এখনও বুঝিবা কবি দান্তে কোনও একটা ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে তাঁর নিজের কোনো অমর কবিতা পাঠ করছেন। যে দৃশ্য আমরা শিল্পীর তৈলচিত্রে মূর্ত হয়ে উঠতে দেখেছি।

পিয়াজ্জালে মিকেলাঞ্জেলোর মাঝখানে

মহাকবি দান্তের বাড়ি

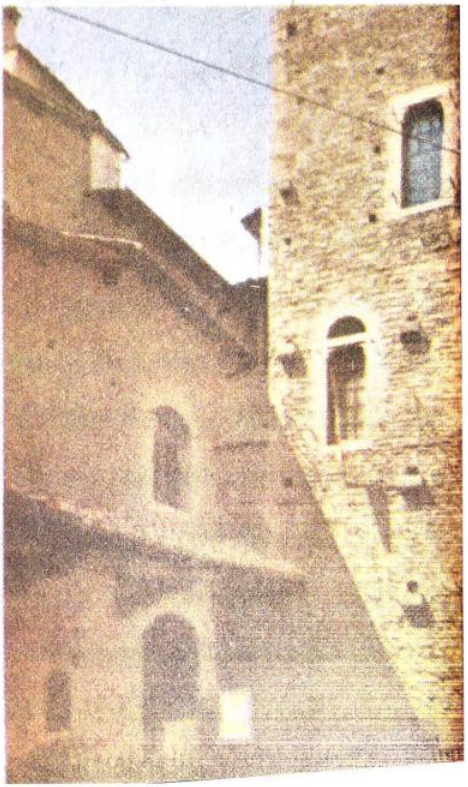

দাঁড়িয়ে আছে অমর শিল্পীর অমর কীর্তি 'ডেভিড' মূর্তির একটা ব্রোঞ্জ কপি। ডেভিডের পায়ের কাছে চার কোণে মিকেলাঞ্জেলোর আরও চারটে বড় কাজের কপি, যার আসল মূর্তি ফ্লোরেন্সের মেদিচি শাসকদের কবরে প্রতিষ্ঠিত আছে। মিকেলাঞ্জেলোর কাজের নমুনা নিয়ে এই আশ্চর্য চকের পরিকল্পনা এবং নির্মাণ যাঁর কীর্তি, সেই জোসেপ পোগ্‌গির প্রশংসায় একটা কথাই লেখা আছে পাথরে : তাকিয়ে দেখুন, এই তাঁর স্মৃতি।

এক সময় ওই পাহাড় থেকে আমাদের নেমে আসতেই হয় ফ্লোরেন্সের নিম্নভূমিতে। পথ চলতে-চলতে বারবার মনে হয়, ফ্লোরেন্স তো কোনও শহর নয়, একটা জীবন্ত জাদুঘরই বুঝিবা। দান্তের শহর ফ্লোরেন্স তার শ্রেষ্ঠ কবিকে নির্বাসিত করেছিল, এবং ১৩০২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দান্তে কুড়িটা বছর নিঃসঙ্গভাবে ভবঘুরের মতন শহরে-শহরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ভীষণ অভিমানও জমে উঠেছিল ক্রমশ, এবং তিনি বলেছিলেন, নানকুয়াম রেভের্তা। আমি কখনও

মিকেলাঞ্জেলোর 'ডেভিড'-এর মুখ

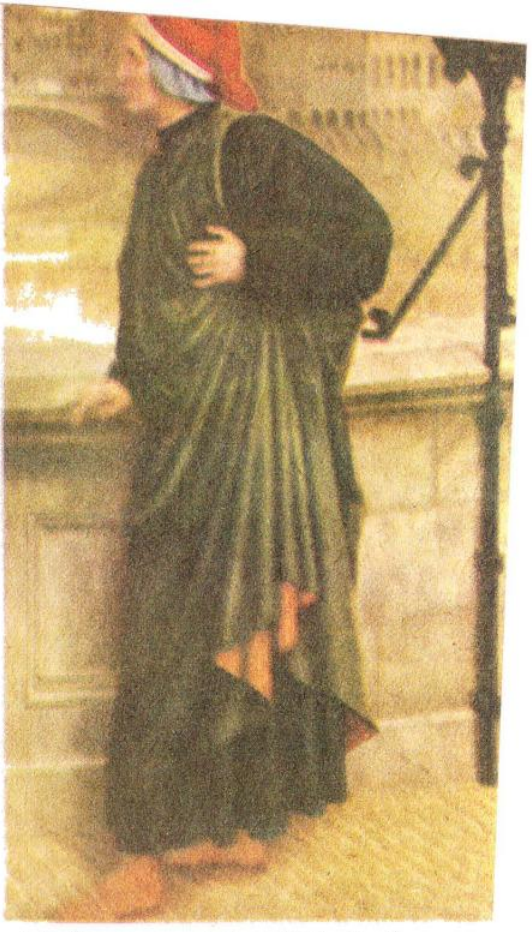

আর্নো নদীর এক সেতুতে দান্তে। বিখ্যাত তৈলচিত্র

আর প্রত্যাবর্তন করব না। ফ্লোরেন্সের নদী আর ব্রিজ দেখলেই আমার মনে পড়ত কবিকে। তারপর এক সময় খুঁজে পেয়েও গেলাম তাঁর বাড়ি। যে-বাড়ির রাস্তার নামই এখন ভিয়া দান্তে আলিগিয়েরি। যে-বাড়িতে তাঁর শিশুসন্তানদের এবং স্ত্রীকে রেখে কবি একদিন নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। এবং যে-বাড়ি ঠিক তেমনই আছে আজও, যেমনটি ছিল ১৩০২ সনের সেই বিষণ্ণ দিনটিতে। একটা ছোটখাটো দুর্গের মতন এই বাড়িকে দেখতে-দেখতে আমি বিভোর হয়ে তার রেলিঙের সামনে বসে পড়েছিলাম। হয়তো খুব ক্লান্ত ছিলাম, কিন্তু ততটা ক্লান্ত নয়, যতটা বিভোর। এবং হঠাৎ এক সময় চোখ ফেটে জল গড়াতে লাগল।

পারবেন কি রাখতে চুপি চুপি?

কোনো কোনো মহিলা মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেশ এগিয়ে চলেন আর জীবনের সাধ আহ্লাদের সামগ্রীও জুটিয়ে ফেলেন।

ঐ কাজটি কি করে সম্ভব—কানাড়া ব্যাংক আপনাকে তা জানাতে পারে।

আপনিও ঐ রকম একজন মহিলা হতে পারেন।

কানাড়া ব্যাংক-এর **বালক্ষেম ডিপোজিট** স্কীম আপনার মত ঘরণীদের জন্যেই—যাঁরা সংসার খরচ থেকে প্রতিদিন অল্প টাকা বাঁচিয়ে চুপি চুপি জমা করতে থাকেন আর হঠাৎ একদিন তাঁর সংসারকে তাক লাগিয়ে দেন!

এমন কি ঘরে প'ড়ে থাকা সামান্য খুচরো পয়সাও আপনার **বালক্ষেম**-এর টি. ভি. বাক্সে চুপি চুপি ফেলে রাখা যায়। আপনি নিজেও জানেন না—আপনার ছোট্ট গোপনীয় কাজটির বিনিময়ে ঘরে আসছে অবাক করার মত এক ভাণ্ডার!

আপনার হাতে আসবে যথেষ্ট টাকা, যা দিয়ে কিনতে পারবেন নিজের জন্যে জমকালো একটি শাড়ী, ছেলের জন্যে সাইকেল অথবা সংসারের জন্যে বিশেষ কোনো সামগ্রী!

আপনার ছোট্ট গোপনীয় কাজের বিনিময়ে আসুন—বিরাট লাভ!

আমাদের অন্যান্য ডিপোজিট স্কীম : **কামধেনু, নিরন্তর, বিদ্যানিধি, সেভিংস, রেকারিং ও ফিক্সড ডিপোজিট।**

কানাড়া ব্যাংক

(একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)
সারা দেশে এই ব্যাঙ্কের 1,300-রও বেশি শাখা আছে

GROWING TO SERVE
SERVING TO GROW
CANARA BANK

maa (S) CB 15 a Ben 81

তবে ফ্লোরেন্স পৌঁছেই মানুষ প্রথমেই যা দেখতে চায় তা হল তার বিশ্বখ্যাত ক্যাথিড্রাল। নানান রঙের পাথরের কারুকার্যে প্রধানত সাদা এবং সবুজ এই গির্জাটির দিকে চোখ ফেললেই শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। গথিক স্টাইলের এই ক্যাথিড্রালের পাশেই শিল্পী জিয়ত্তো একটা অপূর্ব মিনার বা কামপানিল গড়ে দিয়েছিলেন। সবটাই তিনি তাঁর জীবৎকালে শেষ করতে পারেননি, এবং তাঁর উত্তরসূরীরা তাঁর কল্পিত নকশা থেকে কিছুটা সরেও এসেছিলেন। কিন্তু তাহলেও শেষমেশ ওই গির্জা এবং মিনার মিলেমিশে যে আশ্চর্য রূপ নেয়, তা আজকের মানুষের কল্পনায় আসাও মুশকিল। তবে ক্যাথিড্রালের ভিতরটাও তার বহিরঙ্গের চেয়ে কিছু কম বিস্ময়কর নয়। কারণ এর ভিতরে ঢুকেই আমরা মুখোমুখি হই মিকেলাঞ্জেলোর পিয়েতা ভাস্কর্যের। শিল্পীর বিশ্ববিখ্যাত 'পিয়েতা', যেটি রোমের সেন্ট পিটার্সে আছে, তাতে আমরা মা মেরি এবং নিহত যীশুকে পাই। ফ্লোরেন্সের পিয়েতার চারটি চরিত্র—মেরি, যীশু, মেরি মাদলেন এবং যীশুর এক শিষ্য। শিল্পীর শেষ বয়সের কাজ এই পিয়েতায় মৃত্যুর বেদনা যেন একটু বেশিই। রোমের পিয়েতায় মা মেরি শান্ত, করুণায় আপ্লুত। এখানে তিনিই যেন এই মৃত্যুতে ক্ষতবিক্ষত। খুব বড় কাজ, সত্যি।

ক্যাথিড্রালে আরেকটা গভীর কাজ 'দামেনিকো দি মিকোলিনোর'। সেটা ফ্রেসকো। যেখানে দেখতে পাচ্ছি স্বর্গ-মর্ত-পাতালের পটভূমিকায় দান্তে তাঁর মহাকাব্য 'ডিভাইন কমেডি' পড়ছেন। এছাড়া ভাসারি এবং জুকারির আঁকা ফ্রেসকো 'শেষ বিচার'-ও এই গির্জায় শোভা পাচ্ছে। এবং আছে বেনেদেত্তো দি মাহানোর তৈরি জিয়ত্তোর একটা অনুপম আবক্ষ মূর্তি। গির্জা থেকে বার হয়ে এর চারপাশটাও ঘুরে দেখা খুব দরকার। এই গির্জার যে গম্বুজ বা কুপোলা, তা গোটা ফ্লোরেন্স শহরের যে-কোনও প্রান্ত থেকে দেখা যায়। ওটিকে বাদ দিয়ে ফ্লোরেন্সের পটভূমিই যেন কল্পনা করা কঠিন।

এইমাত্র আমি ভাসারির ফ্রেসকোর কথা বলেছি। তবে ভাসারির শ্রেষ্ঠ কীর্তি কিন্তু প্রথম কোসিমোর জন্য বানানো (১৫৬০ থেকে ১৫৭০ সনের মধ্যে) উফিজি প্রাসাদ। এই

বিখ্যাত পুরনো সেতু

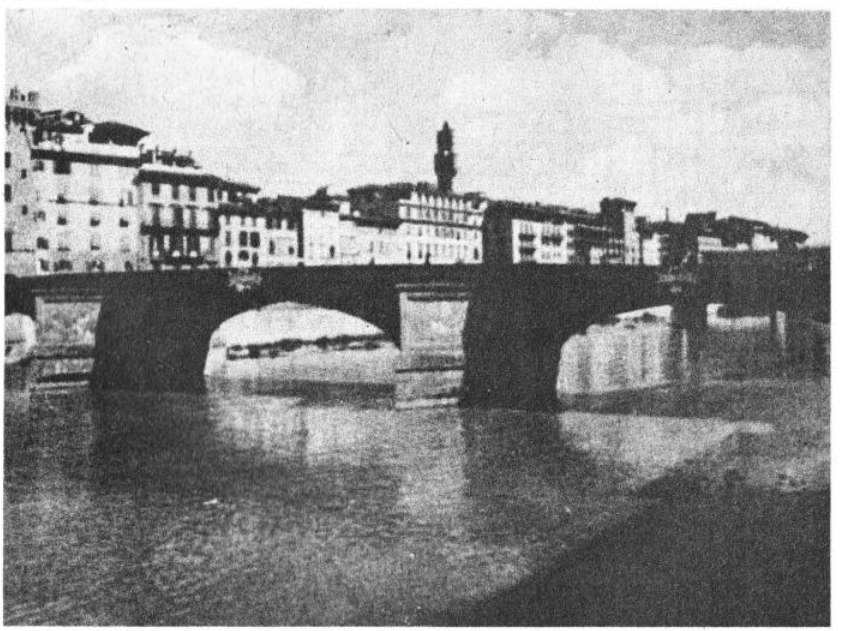

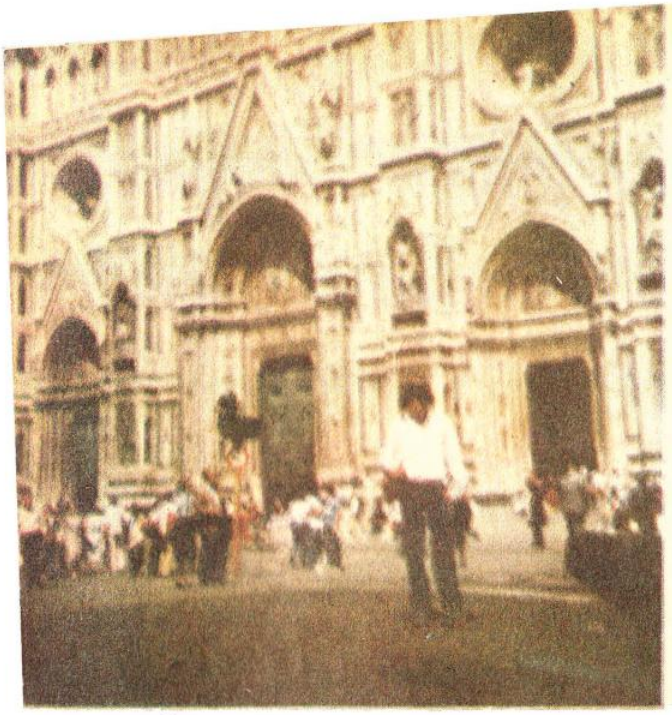

ক্যাথিড্রালের দ্বারপ্রান্ত

জিয়ত্তোর তৈরি কামপানিল। পিছনে

প্রাসাদের দুটো লম্বা বারান্দা আর্নো নদীর মুখোমুখি। এই বারান্দা জুড়ে সাজানো আছে ইতালিরশ্রেষ্ঠ সব মনীষীর মর্মরমূর্তি। বিখ্যাত রাজনৈতিক এবং ভাস্কর বেনভেনুতো চেল্লিনি, জ্যোতির্বিদ গালিলেও, পর্যটক আমেরিগো ভেসপুচ্চি, সাহিত্যিক বোকাচ্চিও, পেত্রার্কা, দান্তে, শিল্পী মিকেলাঞ্জেলা, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, জিয়ত্তো, কিংবা শাসক কোসিমো দি ফার্স্ট ও লোরেনজো দি ম্যাগনিফিসেনট—সবাই এখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। এঁদের দেখতে-দেখতে আমরা ভুলে যাই প্রাসাদের ভিতরে কী আশ্চর্য জিনিসই না আমাদের জন্য অপেক্ষা করেছে। রেনেসাঁসের যে-কোনও মহৎ শিল্পীর কিছু-না-কিছু মহৎ কীর্তি এখানে আছে। আমার জীবনের সব চেয়ে প্রিয় কিছু ছবি আমি এই প্রাসাদের গ্যালারিতে খুঁজে পেয়েছিলাম। ছবির প্রিন্ট দেখেই সেই কবে তাদের ভাল লেগেছিল। তখন জানতামই না, তারা সব এইভাবে আমাকে একদিন বিস্মিত করবে ফ্লোরেন্সের এক প্রাসাদের অভ্যন্তরে। আমি দেখলাম বত্তিচেল্লির ভেনাসের জন্ম এবং বসন্তের রূপক রাফায়েলের স্বর্ণচঞ্চু পাখির সঙ্গে মাদোনা, মিকেলাঞ্জেলোর পবিত্র পরিবার, তিশিয়ানের ফ্লোরা, কোলের কুকুরের সঙ্গে ভেনাস, কারাভেগগিয়োর তরুণ বাকাস। এছাড়া ইতালির বাইরের মানুষ রুবেন্সের আঁকা কটি ছবি এবং ভ্যান ডিকের সৃষ্টি অন্যান্য ছবির মধ্যে গালিলেওর একটা আশ্চর্য প্রতিকৃতি।

গোটা ফ্লোরেন্স যেহেতু গির্জা-শহর এবং শিল্পকর্মে সমৃদ্ধ, তাই এর আলোচনা অনেকটা জাদুঘরের বিবরণের মতন শোনায়। যখনই কোনো রাস্তার মোড় ঘুরে অন্য রাস্তায় পড়বার চেষ্টা করেছি তখনই কোনো-না- কোনো জগদ্বিখ্যাত গির্জা, প্রাসাদ কিংবা জাদুঘরের সামনে পড়ে গেছি। এত অল্প জায়গায় (যদিও ফ্লোরেন্স একেবারে ছোট শহর কিছু নয়) এত ইতিহাস এবং সংস্কৃতির ছড়াছড়ি অন্য কোথাও আছে কি না আমার জানা নেই। ইতালির মাঝখানে একটা নিষ্পাপ, সুন্দর, সুগন্ধময় ফুলের মতন এর অস্তিত্ব। তবে ১৯৬৬ সনের ৪ নভেম্বর এক প্রলয়ঙ্কর বন্যায় ভেসে যেতে বসেছিল গোটা শহরটাই। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আর্নোর জল বিপদসীমা থেকে চড়চড় করে পনরো ফুট বেড়ে উঠেছিল। অসংখ্য অমূল্য

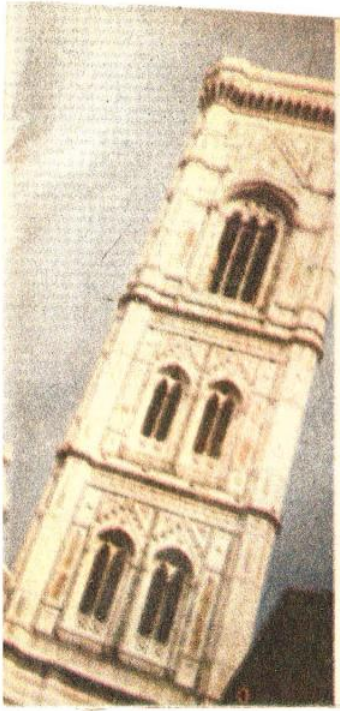

বিশাল গম্বুজ

পিয়াজ্জালে মিকেলাঞ্জেলোতে 'ডেভিড' মূর্তির কপি

চিত্রকলা এবং শিল্পকর্ম চিরতরে নষ্ট হতে বসেছিল। অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গেলেও নগরবাসীরা প্রাণপণ চেষ্টা করে অধিকাংশ শিল্পকর্মকে সেবারে রক্ষা করতে পারে। বহু ক্ষতিগ্রস্ত ছবিকে নানান চেষ্টায় পরে বাঁচিয়ে তোলাও হয়েছে। এখন আর আর্নো কিংবা ফ্লোরেন্সকে দেখলে তা টের পাওয়া যাবে না। কেবল কিছু বাড়ি, কিছু দেওয়াল, কিছু দোকানের গায়ে একেকটা দাগ দিয়ে লেখা আছে দেখা যায়—"১৯৬৬ সনের ৪ নভেম্বর আর্নোর জল এতখানি উঠেছিল।"

জন্মসূত্রে ফ্লোরেন্সের সঙ্গে আবদ্ধ আছেন দান্তে, যদিও এই নগর তার কবিকে বিতাড়িত করেছিল। কিন্তু এই নগরে ভূমিষ্ঠ না হয়েও এখানেই এসে তাঁর বাসস্থান নির্মাণ করেছিলেন রেনেসাঁসের ওই মহান শিল্পী মিকেলাঞ্জেলো বুয়োনারোত্তি। ৭০ নং ভিয়া জিবেলিনায় এখনও তাঁর সেই বাড়ি দাঁড়িয়ে। অবশ্য এখন তা আর বাসস্থান নয়, শিল্পীর অনবদ্য সব কীর্তিতে জমজমাট এক জাদুঘর। ফ্লোরেন্সের সর্বত্র শিল্পীর বিখ্যাত সব ভাস্কর্য এবং চিত্রকলা ছড়িয়ে থাকলেও এই বাড়িটিতে এসে একটা অন্যরকম অনুভূতি হয়। কারণ এই বাড়িতে তিনি কতদিন থেকেছেন! এখানকার প্রতিটি চত্বরে তাঁর পায়ের ধুলো মিশেছে! আকাদেমি গ্যালারিতে তাঁর অমর ডেভিড দেখতে দেখতে কেবলই মনে হচ্ছিল, এসব কাজ তো কোনো মানুষের নয়। এ যেন স্বয়ং ঈশ্বরের! ঈশ্বর ব্যতীত এত প্রাণ কে দিতে পারে নিথর পাথরে?

ফ্লোরেন্স গালিলেওরও শহর। বিজ্ঞানী এখানে বহুকাল কাজ করেছিলেন। এখানকার বিজ্ঞান- জাদুঘরে তাঁর নভো-দর্শনের সব যন্ত্রপাতি আজও আমরা দেখতে পাই। যেমন দেখতে পাই এভানজেলিসতা তোরিচেল্লির তৈরি পৃথিবীর প্রথম ব্যারোমিটার বা বায়ুচাপমান যন্ত্র। বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং শিল্পের ত্রিবেণী সঙ্গমে ফ্লোরেন্স বাস্তবিকই এক কালোত্তীর্ণ ভূমি। এই শহরকে নিয়ে চমৎকার এক রম্যরচনার বই লিখেছেন মার্কিন লেখিকা মেরি ম্যাকার্থি। নাম, 'দি স্টোনস অব ফ্লোরেন্স'। তোমরা বড় হয়ে অবশ্যই সেই বই পড়বে। এবং একদিন গিয়ে নিজের চোখে দেখেও আসবে এই নিরুপম নগরটিকে।

মোচার ঘণ্ট

বাণী বসু

সকালের ডাকের মধ্যে ছিল আঁকাবাঁকা হাতের লেখাওয়ালা একখানা পোস্টকার্ড। পড়তে পড়তেই বাবা ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, "ওরে শমু, তোর ছোট ঠাকুরমার চিঠি এসেছে। অনেক দিন ধরে একাজ্বরি হয়ে রয়েছেন। আশ্চর্য! হারুও তো একটা খবর-টবর দেবে! তুই কাল সকালের ট্রেন ধরেই চলে যা। আজই আমি ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে ওষুধ-পত্তর সব এনে রাখছি।"

মা বললেন, "কী হয়েছে গো?"

"আরে আজ একমাস হতে চলল ছোট খুড়িমার রোজ সন্ধেবেলা জ্বর হচ্ছে। না একটা খবর, না কিছু।"

শমু বলল, "বাবা, আমার বন্ধুদেরও নিয়ে যাব? যাই, হ্যাঁ?"

মা বললেন, "মোটেই না। শুনছ তিনি আজ একমাস ধরে ভুগছেন, বুড়ো মানুষ! দেখতে যাবার নাম করে দৌরাত্ম্যি করতে যাবে, না?"

বাবা একটু ভেবে বললেন, "কথাটা কিন্তু মন্দ না। শমুর বন্ধুরাও অনেকদিন ধরে 'গ্রাম দেখতে যাব, গ্রাম দেখতে যাব' আবদার করছে। টেস্ট পরীক্ষা শেষ। ক'দিন ঘুরে এলই বা! হারু নাহয় বামুন-মেয়েকে ডেকে আনবে, তিনিই রান্নাবান্না করে দেবেন। খুড়িমা ছেলেপুলে ভালবাসেন। অসুখ শরীর, ছেলেগুলোকে পেলে ওঁর ভালই লাগবে।"

মা বললেন, "জানি না বাবা। দস্যি সব! একা শমুতেই রক্ষে নেই!"

"তায় তিনটে বাঁদর দোসর।" শমু যোগ

করল।

"সবই তো জানো দেখছি! জ্ঞানপাপী!" মা হাসতে-হাসতে চলে গেলেন।

আর-তিনটে বাঁদর হচ্ছে গোরা, টুলু আর রঞ্জু। চারজনেই ক্লাস টেনে পড়ে। টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে, মাধ্যমিকের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

গোরা বলল, "চল্, দু-চারদিনের জন্যে ফ্রেশ্ হয়ে আসা যাবে। জিওমেট্রি আর জিওগ্রাফি, এই দুই জিওর ভূত এখনও আমার মাথার মধ্যে কিলবিল-কিলবিল করছে।"

শমু বলল, "সাবধান গোরা, ভূতগুলোকে রায়নায় ছোটঠাকুমার আশেপাশে ছেড়ে দিয়ে আসিসনি যেন। মা বলেছে, আমরা চারটে বাঁদর।"

রঞ্জু বলল, "না রে না, আমরা কি সেই ছেলে? ভীষণ ভাল হয়ে থাকব। খালি তোদের হারুদাকে একটু পুকুরে জাল-টাল ফেলতে-টেলতে বলিস। আর ছোটঠাকুমার ভাঁড়ারের চাবি-ফাবিগুলো..."

টুলু বলল, "তোরা এত হ্যাংলা না! যাচ্ছিস একজন অসুস্থ বৃদ্ধার সেবা করতে। তা না পুকুরে জাল, ভাঁড়ারের চাবি..."

"তা বটে, তা বটে," রঞ্জু বলে উঠল, "আমাদের টুলুবাবু আবার একজন ভাল ছেলে। সমাজ-সেবক। ছুটিতে-ছুটিতে বস্তিতে গিয়ে জ্ঞানের আলো বিতরণ করে আসেন..."

শমুর বাবার এখন কোটে অসম্ভব কাজ। সুতরাং বর্ধমান জেলার অন্তর্গত রায়না-গ্রাম নিবাসী তাঁর ছোটকাকিমাকে দেখে আসবার ভার চার বন্ধুর ওপরই পড়ল। সকাল ৬-৫৫ মিনিটে এক্সপ্রেস ট্রেন ছাড়ে। মোটামুটি খালি কামরায় জানলার ধারে বসতে পেয়েছে চার

সেই পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর অনুভূতির জন্য...

লাইফবয় পার্সোনাল

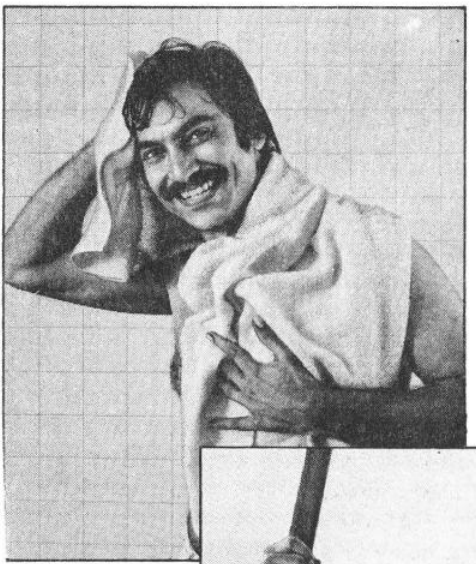

নতুন লাইফবয় পার্সোনাল সেই চির পুরাতন লাইফবয়ের মতই ধুলোময়লার বীজাণু দূর করে...এর সুপ্রচুর ফেনা ও মনমাতানো সুগন্ধ আপনাকে এনে দেয় একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর অনুভূতি। তেমনি আকর্ষণীয় এর গড়ন ও মোড়ক। লাইফবয় পার্সোনাল দিয়েই স্নান করুন... আধুনিক যুগের আধুনিক সাবান!

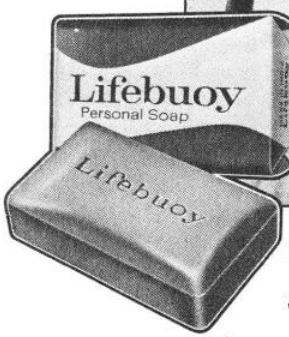

লাইফবয় পার্সোনাল
স্নানে আনে এক অপূর্ব তৃপ্তি

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিন্টাস-LP.10-1812 BG

বন্ধু। সঙ্গে একটা করে ব্যাগ।

ট্রেন ব্যাণ্ডেল পেরিয়ে গেল। পৌষের সকালের শান দেওয়া হাওয়া। দুপাশে খোলা মাঠ। গাছপালা, টেলিগ্রাফের তারে ফিঙের দোল। একটু আগেই আবার চা-শিঙাড়া হয়ে গেছে।

টুলু বলল, "কী যে সব যা-তা খাওয়াস তোরা! একটা টক ঢেকুর উঠল।"

গোরা বলল, "বয়স হয়েছে তো! ও একটু উঠবেই। দাদুদের অমন একটু-আধটু উঠে থাকে। ভাস্কর লবণ দেব?"

"যা যা, ফাজলামি করিস না।"

রঞ্জু বলল, "শমু, আজ কিন্তু আমাদের হরিমটর মনে হচ্ছে। রায়নায় পৌঁছতে অন্তত আড়াইটে-তিনটে। কী হবে বল তো?"

"বর্ধমানে নেমে রেলওয়ে-রেস্তোরাঁয় খেয়ে নেব এখন," শমু বলল, "আজকের দিনটা কষ্ট কর্। কাল থেকে তোদের যা খাওয়াব না! জীবনে ভুলতে পারবি না।"

"কী রকম? কী রকম?" তিনবন্ধু একসঙ্গে বলে উঠল।

"ছোটঠাকুমা রান্না করেন ফার্স্টক্লাস! আমরা প্রতি বছরই একবার, কোনও-কোনও বছর দুবারও যাই। পাশের বাড়ির বামুনদিদি হেল্প করে আর ছোটঠাকুমা রাঁধেন। এই বয়সেও হেভি খাটতে পারেন। কী সব আনাজ-টানাজ দিয়ে ডাল বানান, সুক্তুনি, ধোঁকার ডালনা, ফুলকপির বড়া। কিন্তু সবচেয়ে দারুণ, কী জানিস? মোচার ঘণ্ট। দুর্দান্ত!"

রঞ্জু মুখ ব্যাজার করে বলল, "এই সব সুক্তুনি-ফুক্তুনি, মোচা-ফোচা খাওয়াবি? কোথায় ভাবলুম পুকুরের বড় বড় রুই মাছ..."

"সে তো আছেই," শমু বাধা দিয়ে বলে উঠল, "কিন্তু আমি বাজি ধরে বলতে পারি তুই মাছ ফেলে মোচার ঘণ্ট খাবি, রুই-কাতলা ফেলে মৌরলার অম্বল খাবি।"

গোরা বলল, "হতেও পারে। ঠাকুমা-দিদিমাদের রান্নার স্বাদ সত্যি সত্যিই আলাদা।"

টুলু বললে, "একটা কথা কিন্তু তোরা সবাই ভুলে যাচ্ছিস। ছোট-ঠাকুমা এখন অসুস্থ। খুবই অসুস্থ। তিনি তোমাদের জন্য এত-সব রাঁধতে পারবেন না। এবং, দোহাই, তোমাদের, গিয়েই তাঁর কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান আরম্ভ কোরো না। তাহলে বলা যায় না। হয়ত অসুস্থ শরীরেই..."

পাশে এক ভদ্রমহিলা উল-কাঁটা নিয়ে তীব্রগতিতে বুনে যাচ্ছিলেন। এতক্ষণ কিছু বলেননি। এবার মিটিমিটি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা চার পেটুক দামুতে কোথায় চলেছ?"

অপ্রস্তুত হয়ে গন্তব্যস্থলটার নাম করেই চার বন্ধু চুপ হয়ে গেল।

রায়না গ্রামে শমুদের প্রচুর জমিজমা। ধান-জমি, পুকুর, বাগান, গোরু-বাছুর। সমস্ত কিছুরই দেখাশোনা করেন শমুর বাবার নিঃসন্তান ছোটকাকিমা। ও অঞ্চলে এক ডাকে সকলে তাঁকে চেনে, ভালবাসে, ভক্তি করে। বিষয়-সম্পত্তি যেমন দেখাশোনা করেন, তেমনি আবার ছোটঠাকুমার অন্য কতকগুলো অদ্ভুত গুণ আছে। হাত গুনতে পারেন, অনেক রকম তুকতাক্ জানেন, যার জন্য আশপাশের গ্রাম থেকে বহু লোক বিপদে-আপদে রায়নার মা-ঠাকরুনের কাছে ছুটে আসে। সঙ্গে-সঙ্গে সব সময় থাকে মা-দুর্গার পাশে নন্দীর মতো হারুদা। যেমন বিশাল চেহারা আর স্বাস্থ্য, তেমনি কর্মক্ষমতা। হারুদাকে ফাঁকি দিয়ে কেউ এক পয়সাও ছোটঠাকুমার কাছ থেকে আদায় করতে পারবে না। তাই শমুর বাবা বিষয়-সম্পত্তি এবং ছোটঠাকুমার দেখা শোনা সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিন্ত।

ট্রেন একটু লেট ছিল। বর্ধমানে নেমে রেলওয়ে রেস্তোরাঁয় খেয়ে নেবার প্ল্যানটা ওদের ভেস্তে গেল। রায়নার বাস তখন ছাড়ে-ছাড়ে। শুকনো মুখে চার বন্ধু বাসে উঠে পড়ল। সঙ্গে কমলালেবু ছিল, খেয়ে তেষ্টা মিটল বটে, কিন্তু খিদে আরও বেড়ে গেল। শমুর মা ছোটঠাকুমার জন্যে ভাল সন্দেশ দিয়ে দিয়েছেন। তাতে তো আর হাত দেওয়া যায় না! রঞ্জু দু-এক বার বলেছিল, "দ্যাখ, অত সন্দেশ তো বুড়োমানুষ একলা খেতে পারবেন না!" শুনে শমু এবং টুলু বলেছিল, "সন্দেশের বাক্স একেবারে সীল করা অবস্থায় ঠাকুমার হাতে পৌঁছে দিয়ে তবে আমাদের ছুটি। তারপর যা করতে হয় উনিই করবেন। একলা খাবেন কি পাঁচজনকে বিলিয়ে দেবেন, আমাদের জানবার দরকার নেই।" রঞ্জু দুঃখিত হয়ে বলেছিল, "একটু সীতাভোগ মিহিদানা কেনবারও সময়

ব্রিটানিয়া
দুধ বিস্কুট

বাড়ন্ত বাচ্চার সুস্বাদু সাথী!

সুস্বাদু,
পুষ্টিকর

ব্রিটানিয়া
মিল্ক বিকিস

লিনটাস-BBC.MB.3-1812 BG

দিলি না। বর্ধমানের কত দিনের ঐতিহ্য!"

পিচের রাস্তা দিয়ে হুহু করে বাস ছুটেছে। দুদিকে চাইলেই বোঝা যায় রীতিমত বর্ধিষ্ণু অঞ্চল। হৃষ্টপুষ্ট গোরু চরছে, বাচ্চাগুলো তেল-চুকচুকে। মাঠ থেকে ধান উঠে গেছে, অনেক বাড়ির সামনেই স্তূপীকৃত সোনালি ধান আঁটি বেঁধে রাখা, কোনও-কোনও জায়গায় মরাইয়ে তোলা হয়ে গেছে।

রায়নায় যখন বাস পৌঁছল তখন বেলা প্রায় দুটো। এই দুপুরেও কেমন একটা হাড়-কাঁপানো হাওয়া দিচ্ছে। শমু বন্ধুদের আশ্বাস দিল ডাইনের পায়ে-চলা পথটা ধরে খানিকটা গেলেই ওদের বাড়ি, এবং বাড়ি গেলে চিঁড়ে মুড়ি দুধ কলা নারকোল ইত্যাদির কোনও অভাব হবে না। তার সঙ্গে ভাল পাটালি। পেটটা ভরিয়ে ওরা একটু বিশ্রাম করে নেবে। তারপর গ্রামবাংলা দেখা যাবে।

"ওই তো দেখা যাচ্ছে বাড়ির গেট," শমু চেঁচিয়ে উঠল। বেড়ার গায়ে বাঁশের গেট। ভেতরে উঠোন, দুপাশে করবী গাছ।

শমু ডাকল, "হারুদা-আ।"

সাড়া নেই।

"ছোট ঠাকুমা-আ!" দু-তিন বার ডাকের পর ভেতর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠ ভেসে এল, "কে এলি? খিড়কি দিয়ে ঘুরে আয়। ওদিক বন্ধ।"

বাড়ি প্রদক্ষিণ করে পুকুরের ধারে খিড়কির দরজা। ঢুকতেই ভেতর-উঠোন। বিরাট একটা মরাই। পাশেই দাওয়ার ওপর ঠাকুমার ঘর। বললেন, "কে এলি, গোপাল?"

শমু বন্ধুদের জুতো খুলতে ইশারা করে নিজেও জুতো খুলতে-খুলতে বলল, "হ্যাঁ গো ঠাকুমা, আছ কেমন? এত শরীর খারাপ, আগে খবর দাওনি কেন?"

তিন বন্ধু ঢুকে দেখল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি গ্রাম্য ঘর। কুলুঙ্গিতে সিঁদুর মাখানো ঠাকুর দেবতার ছোট-ছোট মূর্তি। একধারে জলচৌকির ওপর বিশাল-বিশাল তোরঙ্গ। এদিকে তক্তাপোশের ধবধবে বিছানার ওপর আলো-আঁধারিতে একটি বৃদ্ধা শীর্ণ হাত বাড়িয়ে তাদের ডাকছেন। "এসো এসো, দাদুভাইরা। ছোট ঠাকুমাকে দেখতে অ্যাদ্দিনে এলে?"

শমু বললে, "তুমি ওঠো তো, আগে ওষুধ খাও। এই নাও, মা তোমার জন্য সিমলের সন্দেশ পাঠিয়েছে।"

"রাখ্, রাখ্, ওই চৌকিটার ওপর রাখ্ দাদু। হাতটা ধুয়ে এসে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে দে, তবে তো ওষুধ খাব!"

"আমার ট্রেনের কাপড়। জল খাবে তো?"

"না খেলে আর যাচ্ছি কোথায় মানিক? তোমার হাতের জল যে অমর্ত ভাই!"

শমু বাইরে থেকে হাত ধুয়ে এসে ঠাকুমার হাতে পাথরের গেলাসে জল গড়িয়ে দিল। ব্যাগ থেকে ট্যাবলেট বার করে বিছানার ওপর রেখে বলল, "কোথায় তোমার চিঁড়ে-মুড়ি? কলা-টলা দিয়ে বন্ধুদের যাহোক কিছু খাওয়াই!"

"ওমা, ছেলের কী চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা গো! ফলার খেতে যাবি কোন্ দুঃখে? রান্নাবান্না সব তৈরি। যাও তো দাদুরা, কুয়োতলায় গিয়ে চান করে এসো তো! তেল, গামছা, সাবান সব আছে ওখানে। আমি ততক্ষণে সব ব্যবস্থা করে রাখছি।"

"রান্নাবান্না মানে?" শমু অবাক।

ফোক্‌লা দাঁতে হাসতে লাগলেন ঠাকুমা, "আমি যে হাত গুনতে জানি দাদুভাই। কত খিদেই না জানি পেয়েছে! যাও, তাড়াতাড়ি এসো।"

বিরাট ইঁদারা। এই পৌষমাসের শীতেও তার জল ভারী চমৎকার উষ্ণ। ঘানিভাঙা সর্ষের তেল মেখে চান করে ফেলল চার বন্ধুতে। শরীরে আর ক্লান্তি নেই। ঠাকুমার ঘরের দাওয়ায় এসে দেখে সব সাজানো হয়ে গেছে। বড়-বড় চারটে পিঁড়ে পাতা। সামনে কানা-উঁচু বগি-থালায় গোল করে ভাত বাড়া। থালা ঘিরে কত বাটি । থালার মধ্যেও নানা ব্যঞ্জন। পাশে জলের গ্লাস, ছোট্ট রেকাবিতে মুখশুদ্ধি। নিশ্চয়ই ঠাকুমার কিছু স্পেশ্যাল।

টুলু বলল, "ইশ, করেছেন কী ঠাকুমা! জ্বরের ওপর এই এত্তোসব করেছেন? কী কাণ্ড!"

"জ্বর তো সন্দেবেলায়! সকালবেলাটা একটু দুব্বল-দুব্বল লাগে। সে এমন কিছু না। ও বাড়ির বামুন-মেয়ে যোগাড় দিলে, একটু খুন্তি নেড়ে দিলুম। কিচ্ছু কষ্ট হয়নি। তোমাদের জন্যে এটুকু আর পারব না? যা দরকার হয় চেয়ে নিও। লজ্জা কোরো না।"

গোরা বলল, "এর ওপর আবার চাওয়া? এই খেয়ে উঠতে পারলে হয়!"

"মা বলতো আমি গালে কি লাগিয়েছি ?"

"ঠিক বলেছ ! বোরোলীন ! তুমি বলো বোরোলীন লাগালে গায়ের চামড়া ভালো থাকে। তাইতো আমি মুখে, হাতে, পায়ে লাগিয়েছি। এবার আমাকে একটা হামু দাও।"

ছোটদের ত্বকের সুরক্ষার জন্য
সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

বোরোলীন

সাধারণ কাটা-ছড়ার জন্য
একটি কার্যকরী অ্যান্টিসেপটিক

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড আশা মহল কলকাতা ৭০০০৮৮

HTC-GDP-3760R

"সে কী! তোমাদের বাপ-ঠাকুর্দারা যে তোমাদের বয়সে বাজি ধরে হাঁড়ি খেয়ে নিত।"

খেতে-খেতে রঞ্জু অবাক। বললে, "তুই যা যা বলেছিলি সবই যে রান্না করেছেন রে ঠাকুমা! এই দ্যাখ্ আনাজ দিয়ে ডাল, সুক্তুনি, মোচার ঘন্ট, এটা কী? ছানার পাতুরি? ধোঁকার ডালনা, মৌরলা মাছের অম্বল..."

গোরা বললে, "তোর রুই মাছের চাকাও বাটির মধ্যে থেকে ঘাই মারছে রে!"

শমু দেখল বন্ধুদের পাতে পড়লেও ওর নিজের পাতে মৌরলার অম্বল, রুই মাছের ঝাল, কোনোটাই পড়েনি। তাড়াতাড়িতে কি ঠাকুমা অত যোগাড় করতে পেরেছেন? বলল, "নতুন গুড়ের পায়েসের কী গন্ধ বেরিয়েছে দেখেছিস?" চেঁচিয়ে বলল, "ঠাকুমা, এ যে ফাঁসির খাওয়া খাওয়াচ্ছ!"

ঘরের মধ্যে থেকে ক্ষীণ কণ্ঠ ভেসে এল, "বালাই ষাট্,খেয়ে নাও দাদু, কিচ্ছুটি ফেলো না!"

এক-একটি পদ মুখে দিচ্ছে আর তিন বন্ধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। শমু একটুও বাড়িয়ে বলেনি। সত্যিই এমন জিনিস তারা জীবনেও খায়নি। গোরা বলল, "আমার দিদিমার থেকেও ভাল। কী গন্ধ বেরোচ্ছে দেখেছিস?"

শমু বলল, "বাড়ির গোরুর দুধের সরের ঘি, গন্ধ তো বেরোবেই। কিন্তু সত্যি, ছোট্ ঠাকুমা আজ একটা কাণ্ডই করেছেন।" চেঁচিয়ে বলল, "ঠাকুমা, আজ নিজের রেকর্ড নিজেই ব্রেক করেছ।"

ঘর থেকে সাড়া এল না। টুলু উঁকি মেরে বলল, "ঘুমিয়ে পড়েছেন। বেশি চেঁচামেচি করিস না।"

খাওয়ার পর ওদিককার ঘরে নিয়ে গেল শমু। বিরাট কারুকার্যকরা সেকেলে পালঙ্ক। চারজনে চারটে বালিশ নিয়ে গড়িয়ে পড়ল। আরামে চোখ বুজে আসছে। ক্লান্তি, ইঁদারার জলে স্নিগ্ধ স্নান, অপূর্ব খাওয়া, গ্রামের তাজা হাওয়া, শেষ বেলার রোদ। দেখতে-দেখতে চারজনে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল সন্ধেবেলায়, ঘরের দরজায় প্রবল ধাক্কাধাক্কিতে। চোখ মুছতে মুছতে খিল খুলে দিল শমু। সামনে হারুদা। এই শীতেও খালি গা। নতুন কোরা কাপড়ের কোঁচাটা গলায়।

"কখন এলি?"

"কেন, ঠাকুমা বলেনি? দুটো নাগাদ এসে পৌঁছেছি।"

"ঠাকুমা বলেনি মানে?" হারুদার মুখ হাঁ "তুমি ছিলে কোথায়? এখনও ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করোনি?"

সে-কথার উত্তর না দিয়ে হারুদা বললে "সব তো তালা দেওয়া, ঢুকলি কী করে?"

শমু বলল, "খিড়কি খোলা ছিল। ঠাকুমা ওদিক দিয়েই আসতে বলল।"

"তারপর?"

"তারপর আবার কী? চান করলুম, ঠাকুমা রেঁধে রেখেছিল খেলুম। হ্যাঁ, ঠাকুমাকে ওষুধ খাইয়েছি, বাবা পাঠিয়েছেন।"

"কী খেলি?"

"ওরে বাবা, সে অনেক। সুক্তুনি, মোচার ঘন্ট, ধোঁকার ডালনা..."

হারুদার হাতে লণ্ঠন। আলো পড়ে চোখ দুটো চিকচিক করতে লাগল। বলল, "গোপাল এই মাত্র মা-ঠাকরুনকে দাহ করে ফিরছি।"

"মানে?" চিৎকার করে উঠল শমু "আমাদের খাইয়ে-দাইয়ে ঠাকুমা মারা...

"না, তোদের খাওয়াবার আগেই। গতকাল রাত একটায়। টেলিগ্রাম করে দিয়েছি। বাবু আজ কি কাল পাবেন। মা-ঠাকরুনের হুকুম ছিল, ছ-সাত ঘণ্টার বেশি যেন দেহ না রাখা হয়। ও-পাড়ার রতন ভট্চাজ মুখাগ্নি করলেন।"

শমুর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না কোনোমতে বলল, "কিন্তু আমরা যে...আমাদের যে..."

হারুদা বলল, "আয়, দেখবি আয়।"

সারি-সারি ঘরে তালা ঝুলছে। দালানে ওদের ভূরিভোজের চিহ্নমাত্র নেই। ঠাকুমার ঘরের তালা খুলতে খুব সুন্দর একটা গন্ধ ওদের নাকে এসে লাগল। রঞ্জু দেখল, জলচৌকির ওপর রাখা সন্দেশের বাক্সটাতে পিঁপড়ে ধরেছে। ঘরের কোণে একটা পিদিম জ্বলছে আর, সেই পিদিমের আলোয় শমুদের দেওয়া গ্রাম্য বাড়ির দেওয়ালে টাটকা রজনীগন্ধার মালার মধ্য থেকে একটি মমতাময়ী বৃদ্ধার ছবি তাদের দিকে তাকিয়ে ইষৎ কৌতুক, স্নেহের হাসি হাসছে।

ছবি: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

সিসের আংটি

বিমল কর

আগে যা ঘটেছে : শিশিরের অদ্ভুত অসুখ। চোখের ...নে নানা আজগুবি ব্যাপার ঘটে। অচেনা লোক ..., কাছে যা আছে, তা না-রাখাই ভাল। সেটা কি এই ...না আংটি? বাবুদা তাকে কৃষ্ণদয়ালের কাছে নিয়ে ...। তিনি নানা অভিশপ্ত বস্তুর কথা শোনান। ভুয়ো ...গ্রামে পিসিমার অসুখের খবর পেয়ে শিশির ...রিবাগে আসে। সেখানে আক্রান্ত হয়েও বেঁচে ...। আলাপ হয় সিংহিবাবুর সঙ্গে। তিনি বলেন, ...গ নামে যে লোকটি শিশিরদের বাড়িতে কাজ ..., সে-ই হয়তো কোনও ওষুধ মেশাত তার ...রে। ভবতোষ সান্যালের বাড়িতে টেলিগ্রাম-ফর্মের ... মেলে। সান্যালের বাসে উঠে সিংহিবাবু দুর্ঘটনায় ...। তিনি জানান, শিশিরদেরই প্রতিশোধলিপ্সু ...য় সান্যালের পরামর্শে তিনি ওষুধ খাইয়ে পাগল ... চেয়েছিলেন শিশিরকে। বাড়িতে ফিরে শিশির ...র শব্দ শুনতে পায়। তারপর...

॥ ২৭ ॥

...কালে উঠে শিশির প্রথমেই বাবাকে চিঠি ...ত বসল। ভবতোষ ওরফে শ্যামসুন্দর ...লের ব্যাপারটা সরাসরি বাবার কাছ থেকে ...জানতে চায়।

...শির বোকা নয়। সে জানে খোলাখুলি সব ...ললে বাবা ভয় পেয়ে যেতে পারে। বাবা ...ভতু ধরনের মানুষ তা নয়; বরং ...-ভেতরে শক্ত, সহজে ঘাবড়ে যায় না। ...শিরের অসুখের পর থেকে খানিকটা যেন ...থাকে। শিশির বাবাকে ভয় পাওয়াতে ...।

...য়, অনেক কথা বাদ দিয়ে শিশির লিখে ফেলল। লিখে বাবুকে দিল। "বাবুদা, একবার পড়ে দ্যাখো। ঠিক আছে তো?"

বাবু চিঠিটা পড়ল। "ঠিক আছে।"

"আজই এটা পোস্ট করব। চলো, চা জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়ি। কাল কে যে বন্দুক চালাল সেটাও খোঁজ করতে হবে।"

কালকের বন্দুক ছোঁড়ার ব্যাপার নিয়ে বাড়িসুদ্ধু সবাই অনেকক্ষণ আলোচনা করেছে। শশধরের ধারণা, ডাকাত-টাকাতের ব্যাপার হতে পারে। ভোলাবাবুর কুঠিতে ডাকাতি হয়ে যাবার পর ওই রকমই সন্দেহ হয়। আশালতা মনে করেন, ডাকাতরা আরও রাত করে আসে, অত কাঁচা কাজ তারা করবে না। শব্দটা অন্য কিছুর। কিসের তা তিনি বলতে পারেন না। বাবু আর শিশির অন্যরকম সন্দেহ করছিল, কিন্তু পিসেমশাইয়ের কাছে কিছু বলল না। রাত্রে শুয়ে শুয়ে আলোচনা করল। হেমবাবুর ব্যাপার হতে পারে। তিনি কি সন্দেহজনক কিছু দেখেছিলেন?

দুজনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমেই গেল সিংহিবাবুর কাছে।

বাইরেই ছিলেন সিংহিবাবু।

"কাল আপনার বাড়ি থেকে ফিরে যাবার খানিকটা পরে গুলি ছোঁড়ার শব্দ পেলাম। শুনেছেন আপনি?" শিশির জিজ্ঞেস করল।

মাথা হেলালেন সিংহিবাবু। "তোমরা যাবার অনেকটা পরে ঘটনাটা—মানে ওই শব্দ শোনা গেছে। ন'টা সোয়া-ন'টা নাগাদ।"

"গুলির শব্দ না?"

"হ্যাঁ।"

বাবু বলল, "মাঠের দিকে শব্দটা হল বলে আমাদের মনে হয়েছে। আপনার বাড়ির কাছাকাছি কোথাও কেউ বন্দুক ছুঁড়েছিল?"

সিংহিবাবু কয়েক পলক রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, "তোমরা চলে যাবার পর আমি ভেতরে চলে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। হাতটায় যন্ত্রণা হচ্ছিল। শুয়ে শুয়েই শব্দটা কানে গেল। আমি আর উঠিনি। আমার বাড়ির কাছেই কেউ গুলি চালিয়েছে।"

"আপনি একবার দেখবার চেষ্টাও করলেন না?"

"না," সিংহিবাবু মাথা নাড়লেন। "দেখে লাভ কী? আমার কাছে বন্দুক থাকলে দেখবার

চেষ্টা করতাম।"

শিশিরের কেমন সন্দেহ হল। বলল, "আপনি কিছু সন্দেহ করছেন?"

"করছি," মাথা নাড়লেন সিংহিবাবু। "আমার সন্দেহ ভবতোষের লোক এসেছিল।"

শিশির আর বাবু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। বাবু বলল, "আপনি ঘরে রয়েছেন, তা জেনেও বাইরে কেউ বন্দুক চালাবে কেন?"

"আমিও সেটা বুঝতে পারছি না। কাল আমরা যখন বারান্দায় বসে কথা বলছিলাম—তখন রাস্তা থেকে কেউ গুলি চালাতে পারত। চালালেও অন্ধকারে আন্দাজে চালাতে হত। গুলিটা নষ্ট হত। না-হয় আমাদের তিন জনের যে-কোনো লোকের গায়ে লাগতে পারত। ভগবান তোমাদের বাঁচিয়েছেন।"

শিশির শিউরে উঠল। সিংহিবাবু যা বলছেন তা ঠিকই। তারা তিনজনে বারান্দায় বসে কথা বলছিল কাল সন্ধেবেলায়। একটা টিমটিমে লণ্ঠন জ্বলছিল হাতকয়েক তফাতে। রাস্তা থেকে ভাল করে নজর করলে হয়তো তাদের দেখা যেত। কিন্তু বন্দুকের নিশানা ঠিক করে গুলি ছোঁড়ার মতন অবস্থা ওটা নয়, কাজেই গুলি ছুঁড়লে সেটা নষ্টও হতে পারত, বা তাদের যে-কোনো একজনের গায়েও লাগত পারত।

শিশির বলল, "ভবতোষের লোক কি আপনাকে খুন করতে এসেছিল?"

"আমার তাই মনে হয়।"

"কেন?"

"কারণ সে তার লোক দিয়ে আমায় একবার, পরশুদিনই মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল। পারেনি।"

"পারেনি বলেই আবার চেষ্টা করবে?"

"করবে না? করাই তো স্বাভাবিক। ভবতোষ আগেই বুঝেছে আমি আর তার দলের লোক নই, বন্ধু নই; উলটে আমি এখন তার শত্রুপক্ষের লোক হয়ে গিয়েছি। আমাকে সে সরাতে চায়।"

"শত্রুপক্ষ মানে আমাদের লোক?"

"তা ছাড়া আর কী!" বলে সিংহিবাবু যেন একটু হাসবার চেষ্টা করলেন। বললেন, "শিশির, কাল আমি অতটা বুঝিনি। যদি আমার মনে হত, ভবতোষের লোক এত তাড়াতাড়ি, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আবার আমার প্রাণটি কেড়ে নেবার চেষ্টা করবে তাহলে আমি

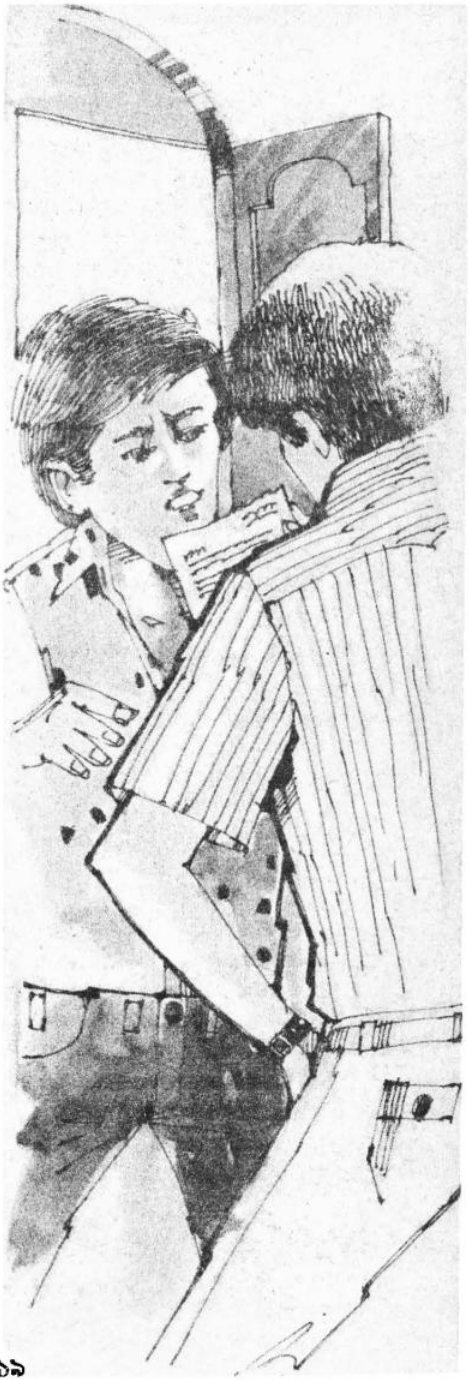

হাই পাওয়ার সার্ফ ধোয় সবচেয়ে সাদা ক'রে...

এমন, যা নজরে পড়ে!

হাই পাওয়ার সার্ফে আছে বেশী পরিষ্কার করার ক্ষমতা, যা কাপড়ের ধূলোময়লার প্রতিটি কণা তুলে বের ক'রে ফেলে। সত্যিকারের ময়লা জামাকাপড়ও ক'রে তোলে ধবধবে সাদা!
তাই তো, বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড় ধোয়ার জন্যে অন্য পাউডারের চেয়ে সার্ফই বেশী ব্যবহার করেন।

বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড় ধোয়ার জন্যে অন্য পাউডারের চেয়ে সার্ফই বেশী ব্যবহার করেন।

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন।

লিনটাস-SU-224-1810 BG

তোমাদের নিয়ে বারান্দায় বসে কথা বলতাম না। লোকটা একেবারে খেপে গিয়েছে। না হলে এত ধড়ফড় করে কাজ করত না। আমার ধারণা, কাল আমরা বাইরে বসে কথা বলছি—এটা ওর লোক নজর করেছে। হয়তো তাতে আরও ঘাবড়ে গিয়েছে।"

শিশির আর বাবু বলার মতন কথা খুঁজে পেল না। ভবতোষ কি তাদের প্রত্যেককে সারাক্ষণ নজরে রেখেছে! আশ্চর্য! তার হাতে এত লোক?

বাবু বলল, "কিন্তু আপনি যখন বাড়ির মধ্যে তখন ভবতোষের লোক গুলি চালাবে কেন বুঝতে পারছি না, সিংহিদা।"

বাবুর মুখে 'সিংহিদা' বেশ মানিয়ে গেল। সিংহিবাবু কিছু মনে করলেন না।

সিংহিবাবু বললেন, "আগেই বলেছি, এই ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছে না। এ-রকম বোকামি কেন তার লোক করবে?"

শিশির বলল, "এমনও তো হতে পারে, আপনি যা ভাবছেন তা নয়।"

"তা হলে কী?"

"ধরুন ডাকাতির চেষ্টা বা অন্য কিছু?"

"রাত ন'টায় কেউ ডাকাতি করতে আসে না। তা ছাড়া ক'দিন আগে অত বড় ডাকাতি হয়ে যাবার পর পুলিশের নজর আছে এদিকে।"

শিশিরের মুখ দিয়ে হেমবাবুর নামটা বেরিয়ে পড়ছিল, অনেক কষ্টে সামলে নিল।

সামান্য চুপচাপ।

সিংহিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যাচ্ছ তোমরা?"

শিশির কথা লুকোল না, বলল, "প্রথমে পোস্ট-অফিস যাব। বাবাকে একটা চিঠি লিখেছি। চিঠিটা ফেলে আসব।"

"চিঠি লিখে ভালই করেছ। ভবতোষের আসল নামটা লিখেছ? শ্যামসুন্দর?"

"হ্যাঁ।"

"পরের মুখে ঝাল খাওয়া ভাল নয়, তুমি ঠিক কাজই করেছ।... আমার কথা লিখেছ কিছু?"

শিশির একবার বাবুর মুখের দিকে তাকাল, তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "আপনার কথা সামান্যই বলেছি। মানে, আপনার মুখ থেকে যে ব্যাপারটা শুনেছি তার বেশি কিছু বলিনি। বললে বাবা ভয় পাবে।"

কিছু যেন ভাবলেন সিংহিবাবু, তারপর বললেন, "আমি তোমায় যতটা পেরেছি বলেছি, পরে হয়তো আরও শুনবে। যাক, তোমরা যাও। একটা কথা এখন থেকে মনে রেখো। আমাদের ওপর ভবতোষের নজর আছে। সাবধানে ঘোরাফেরা করবে। আর সন্ধের পর বাইরে ঘুরবে না।"

মাথা নাড়ল শিশির। সে বুঝতেই পারছে, ব্যাপার আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে। সাবধানে থাকতে হবে।

পোস্ট-অফিসে চিঠি ফেলে শিশিররা বংশীর দোকানে আসতেই দেখল, বংশী গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে আছে।

বংশী শিশিরদের দেখে প্রথমেই বলল, "কী, কাল কেমন বন্দুকবাজি হল?"

শিশির অবাক। "তুমি জানলে কেমন করে?"

"সব জানি। দুবার আওয়াজ পেয়েছ গুলির! তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"গুলি দুটো হেমবাবু ছুঁড়েছিলেন। পিস্তলের গুলি।"

বাবু আর শিশির একেবারে বোকার মতন তাকিয়ে থাকল।

(ক্রমশ)

এক আমেরিকান ভদ্রলোক রুডিয়ার্ড কিপলিঙকে লিখলেন, "শুনতে পাই আপনি আপনার সাহিত্য বিক্রি করেন শব্দপ্রতি এক ডলার হিসেবে। এই সঙ্গে একটি ডলার পাঠালাম, স্যাম্পেল পাঠাবেন।" ডলারটি রেখে দিয়ে কিপলিঙ জবাবে শুধু লিখলেন, "ধন্যবাদ।" দু-সপ্তাহ পরে সেই ভদ্রলোকের চিঠি এল, "আপনার পাঠানো 'ধন্যবাদ' দু-ডলারে বিক্রি করতে পেরেছি। খরচখরচা বাদ দিয়ে যা মুনাফা হয়েছে তার আদ্দেক, ৩৫ সেন্ট, এইসঙ্গে পাঠালাম। ডাকখরচ কেটে রেখেছি।"

বসু-বাড়ি

শিশিরকুমার বসু

॥ ৪০ ॥

ডিসেম্বর মাসটা যতই এগোতে লাগল, মনে হল রাঙাকাকাবাবু ক্রমেই অস্থির হয়ে পড়ছেন। প্রথমে আমাকে বলেছিলেন যে বড়দিনের ছুটি নাগাত বেরিয়ে পড়তে চান। কিন্তু মিঞা আকবর শাহের দিক থেকে সিগন্যাল পেতে দেরি হচ্ছিল।

এরই মধ্যে বোম্বাই থেকে দুই অতিথি এসে পড়লেন— বসুবাড়ির বিশেষ বন্ধু নাথালাল পারেখ ও তাঁর স্ত্রী। নাথালালের সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর তিরিশের দশকে ইউরোপে আলাপ হয়। প্রবাসে পারেখ-পরিবারের আতিথেয়তায় রাঙাকাকাবাবু মুগ্ধ হন। দেশে ফেরার পর নাথালাল আরও অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন। ১৯৩৮-এ কংগ্রেস সভাপতি হবার পর থেকে ১৯৪১-এ দেশত্যাগ করা পর্যন্ত রাঙাকাকাবাবু যতবারই বোম্বাই গিয়েছেন নাথালালের মেরিন ড্রাইভের বাড়িতে থেকেছেন। বাবা-মার সঙ্গে আমরাও নাথালালের বাড়িতে থেকেছি। ১৯৩৯-এর পুজোর ছুটিটা বাবা-মা ও আমরা সকলে নাথালাল ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মহারাষ্ট্রের মহাবালেশ্বর পাহাড়ে খুব আনন্দে কাটিয়েছিলাম। ত্রিপুরী কংগ্রেসে পারেখ-দম্পতি রাঙাকাকাবাবুর পাশে-পাশে ছিলেন এবং যথাসাধ্য সেবা করেছিলেন।

এবার রাঙাকাকাবাবু নাথালাল ও তাঁর স্ত্রীর থাকবার ব্যবস্থা উডবার্ন পার্কের বাড়িতে করতে বললেন। বাড়ি তো তখন খালি, কেবল আমি আছি। সেজন্য তাঁদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা এলগিন রোডের বাড়িতেই ছিল। বোম্বাই ফেরবার আগে ডিসেম্বরের শেষে তাঁরা শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গেলেন। সেখান থেকে ফিরে তাঁরা নতুন বছরের প্রথমেই বোম্বাই ফিরে যাবেন।

প্রথম প্রথম আমার মনে হয়েছিল যে, আমাকে রাঙাকাকাবাবু সম্ভবত বর্ধমান স্টেশনে পৌঁছে দিতে বলবেন, কারণ তিনি ফেরবার পথে রিষড়ার বাড়িতে রাত কাটাবার কথা বলেছিলেন। কিন্তু পরে মনে হল তিনি আরও অনেক লম্বা পাড়ির কথা ভাবছেন। কারণ আমাকে তিনি পরে বললেন যে, তাঁকে আসানসোল বা তার কাছাকাছি কোনো স্টেশনে পৌঁছে দিতে হবে। প্ল্যানটা হবে এই রকম—আমি ভোর রাত্তিরে তাঁকে পথের কোনো-একটা ডাকবাংলোয় নামিয়ে দেব। তিনি দিনটা সেখানে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবেন। আর আমি চলে যাব ধানবাদের কাছে আমার দাদার বারারির বাড়িতে। পরের দিন সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকবাংলো থেকে তুলে তিনি যে স্টেশনে ট্রেন ধরতে চান আমি পৌঁছে দেব। দাদা-বৌদির কাছে আমার বারারি যাওয়ার একটা অজুহাত বের করা তো খুবই সহজ।

এমনিতেই জানুয়ারির প্রথমে আমার বারারি যাবার কথা ছিল। তার উপর রাঙাকাকাবাবু বললেন যে, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও ঐ এলাকাটা আমার একবার ভাল করে দেখে এলে ভাল হয়। মা ও ছোটদের বারারি থেকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি এই অজুহাত দেখিয়ে আমি নাথালালদের সঙ্গে বোম্বাই মেলে চাপলাম। মাঝরাতে ধানবাদে নেমে গেলাম। সেখান থেকে বারারি বেশি দূর নয়।

ঠিক যেমন রাঙাকাকাবাবু বলে দিয়েছিলেন, বারারি ছাড়বার আগে আমি দাদাকে বললাম, দিনকতক পরে রাঙাকাকাবাবুর কোনো কাজে আমি ঐ অঞ্চলে আসব, সেই সময় আমি আবার বারারিতে আসব।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড থেকে ধানবাদ যাবার রাস্তা ও ধানবাদ থেকে বারারি পর্যন্ত পথঘাট আমি ভাল করে দেখে নেবার চেষ্টা করলাম। ধানবাদ থেকে বারারির পথটা একটু গোলমেলে

ঠেকেছিল। পথের কতকগুলো বাড়িঘর, ছোটখাটো ব্রিজ, কটা বাঁক আছে, ইত্যাদি মনে ধরে রাখবার চেষ্টা করলাম। তবে দাদার বাড়ির পেছনেই বড় বড় চিমনিওয়ালা কারখানাটা বেশ একটা বড় দিক্‌চিহ্ন ছিল। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর, ধানবাদের দিকে মোড় নেওয়ার আগে গোবিন্দপুর বলে একটা জায়গায় বাঁশের বেড়া নামিয়ে গাড়ি থামিয়ে নম্বরটা লিখে নিল নজর করলাম।

কলকাতা ফেরার পথে স্টুডিবেকার গাড়িটা আসানসোল ও বর্ধমানের মাঝে বেশ একটা গণ্ডগোল করে বসল। এমন একটা যন্ত্র ভেঙে গেল যে সেখানে সারানো সম্ভব হল না। একটা গ্যারাজে গাড়িটা রেখে মামাবাবুর সঙ্গে আমরা একটা নড়বড়ে ট্যাক্সি চেপে কলকাতায় ফিরলাম। ব্যাপারটাতে আমি তো বেশ শঙ্কিত হলাম। রাঙাকাকাবাবুকে নিয়ে যদি ওয়াণ্ডারার গাড়ি এ-রকম ব্যবহার করে তাহলে কী উপায় হবে!

কলকাতায় ফিরেই রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে নিয়মমতো জল্পনা-কল্পনা শুরু হল। বাবাও কালিম্পং থেকে ফিরলেন। রাঙাকাকাবাবু আমাকে বলেছিলেন, "মাকে বলে রেখো, যেদিনই তোমার বাবা কলকাতায় পৌঁছবেন সেদিনই সন্ধ্যায় যেন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন।" তাই হল। সেদিন সারা সন্ধ্যাটাই বাবা ও রাঙাকাকাবাবু নিভৃতে কথা বললেন। আমি বাইরেই রইলাম। পরের দিন সন্ধ্যায় মা একটু হেসে আমাকে বললেন, "উনি বলছিলেন, তোমার ছেলে কি আমাদের না জানিয়েই এই সব কাণ্ড করতে যাচ্ছিল নাকি?" যাই হোক, বাবা-মার দিকটা এইভাবে সমাধান হয়ে যাওয়াতে আমি বেশ নিশ্চিন্ত হলাম। বাবা কিন্তু ১৬ই জানুয়ারি সন্ধ্যা পর্যন্ত এ-বিষয়ে আমার সঙ্গে কোনো কথাই বললেন না। মা কেবলই বলতে লাগলেন, একটু আগে জানতে পারলে আরও বেশি দেখাসাক্ষাৎ করে নিতে পারতাম, অনেক কথাবার্তা হতে পারত।

প্রথমের দিকেই বাবার সম্বন্ধে কথা তুলে রাঙাকাকাবাবু বলেছিলেন যে, বাবার সেই সময়কার শরীরের অবস্থা দেখে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন। তাঁর মনে হয়েছিল, বাবার স্নায়বিক অবস্থা অন্তত সাময়িকভাবে বেশ খারাপ। আরও বলেছিলেন যে, তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি

সুভাষচন্দ্র, সেই সময়ে

কোয়ালিটি সবার ওপরে....দাম সবার নীচে!

নিউট্রামূল—আমূলের অবদান ! অর্থাৎ সেরা গুণমান, এ একেবারে গ্যারান্টী ! গুণ-সমৃদ্ধ সুস্বাদু কোকো। পুষ্টিতে ভরপুর আমূল মিল্ক। বাছাই করা সেরা মল্ট। একান্ত প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজপদার্থ। আর শক্তি বাড়িয়ে তোলার এমন সব গুণ—যার তুলনা নেই !

এত কিছু—অন্যের তুলনায় প্রায় ৪ টাকা কম দামে !

নিউট্রামূল "দাদা" হয়ে যান....আর বাকি পয়সা বাঁচান !

অন্যের তুলনায় প্রায় ৪ টাকা কম দামে !

নিউট্রামূলের মত অন্য পানীয়র সঙ্গে দামের তুলনা (টাকা)*

নন্ ফ্ল্যাক্সিবল্ প্যাকেজিং

	৫০০গ্রাঃ	৮০০গ্রাঃ	১০০০গ্রাঃ
নিউট্রামূল টিন	১৩.৮৩	–	২৬.৬৭
মাল্টোভা বৈয়াম	১৭.৫৮	–	–
বোর্ণভিটা টিন	১৭.৬৮	২৬.৯৭	–
বুস্ট বৈয়াম	১৮.৮৭	–	–

* মার্চ ১৯৮১-র সর্বাধিক গ্রাহক-মূল্য। স্থানীয় কর আলাদা

IS : 1806

বাজারে ছেড়েছেন :

গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড আনন্দ, ৩৮৮০০১.

daCunha/81/GCM/53/BN

সঙ্কট-মুহূর্তে তিনি বাবার পরামর্শ ও সমর্থন চেয়েছেন, পেয়েছেনও। তাঁর ভয় হয়েছিল, যদি বাবা মন শক্ত করতে না পারেন এবং রাঙাকাকাবাবুকে এত বড় বিপদের ঝুঁকি নিতে বারণ করেন তাহলে তিনি মহা মুশকিলে পড়ে যাবেন। যাই হোক, পরের দিন রাঙাকাকাবাবুর কাছ থেকে যা শুনলাম তাতে তো মনে হল না যে বাবা কোনোরকম আপত্তি তুলেছেন। বরং মনে হল পুরো পরিকল্পনাটা তাঁরা দুজনে খুঁটিয়ে বিচার করেছেন এবং বাবা বেশ কতকগুলি ব্যাপারে অদলবদল করতে পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন, এলগিন রোডের বাড়িতে একমাত্র ইলার উপর সব দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না বলে বাবা মনে করেছিলেন। কারণ সেক্ষেত্রে পুলিশের সব জুলুম বাড়ির ঐ মেয়েটির উপর পড়বে। এই সূত্রে রাঙাকাকাবাবু আমার সঙ্গে আমার জ্যাঠতুত ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্ভাব্য ভূমিকা সম্বন্ধে কথা বলেছিলেন।

বাড়ি থেকে উধাও হবার পর ব্যাপারটা কী উপায়ে গোপন রাখা যাবে তার পরিকল্পনাটা ধীরে-সুস্থে রাঙাকাকাবাবু একদিন আমাকে বললেন। আমি তো শুনে অবাক। লোকে বিশ্বাস করবে তো! বললেন, তিনি যথাসময়ে বাড়ির লোকেদের জানিয়ে দেবেন যে, তিনি একটা ব্রত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং কিছুদিন সম্পূর্ণ নির্জনবাস করবেন। সকলে জানবে যে তিনি নিজের শোবার ঘর থেকে মোটেই বের হন না, কারুর সঙ্গে দেখা করেন না বা টেফিফোনেও কারুর সঙ্গে কথা বলেন না। এ-ব্যাপারে বড় রকমের কোনো প্রচার হবে না, খবরের কাগজেও কোনো ঘোষণা করা হবে না। বাইরের কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে বা টেলিফোন করলে জানিয়ে দেওয়া হবে যে, দিনকয়েকের জন্য তিনি নির্জনবাস করছেন। আস্তে আস্তে খবরটা ছড়াবে। মা-জননীর ঠাকুর তাঁর খাবার পর্দার আড়াল থেকে রেখে দিয়ে যাবে। যাতে সকলে বিশ্বাস করে যে, সত্যিই তিনি ঘরে আছেন, তার জন্য সব ব্যবস্থা মনে-মনে ঠিক করে ফেলেছিলেন। খাবারগুলো খাওয়া এবং ঘর ব্যবহার করার ভার তো দিয়ে যাবেন। তাছাড়া অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন রকমের স্লিপ নিজের হাতে লিখে দিয়ে যাবেন যেগুলো বুঝেসুঝে আগন্তুকদের দেওয়া হবে। কোনোটায় লেখা থাকবে, এ-ব্যাপারে কংগ্রেস অফিসে আশরাফউদ্দীন-সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, এ-বিষয়ে করপোরেশনের অমুক কাউন্সিলারের সঙ্গে কথা বলুন, ইত্যাদি। তাছাড়া কতকগুলো চিঠি লিখে দিয়ে যাবেন যেগুলো তাঁর অন্তর্ধানের পর ভিন্ন-ভিন্ন তারিখে ছাড়া হবে। চিঠি লিখবেন বিশেষ করে জেলে বন্দী তাঁর সহকর্মীদের নামে, যাতে সেগুলি পুলিশ বিভাগের নজরে পড়ে এবং তারা মনে করে যে সুভাষবাবু তাঁর কলকাতার বাড়ি থেকে চিঠি লিখছেন।

ক্রমেই আমার মনে হতে লাগল, যে-কোনোদিন যাত্রার সঙ্কেত এসে পড়তে পারে। শেষের কয়েকদিন দেখা হলেই প্রথমেই রাঙাকাকাবাবু জিজ্ঞাসা করতেন—প্রস্তুত তো? সুতরাং আমি গাড়ির দিকে নজর দিলাম। বাবাকে বলে একটা নতুন টায়ার ও ব্যাটারির ব্যবস্থা করলাম। যাত্রার ঠিক আগেই যাতে গাড়িটা ভাল করে সার্ভিসিং করিয়ে নেওয়া যায় সেজন্যে আমাদের সেই সময়কার বাঁধা গ্যারাজ ইন্টারন্যাশনাল টায়ারস অ্যাণ্ড মোটরস্-এ কথাবার্তা বলে এলাম। সমস্যা হল ওয়াণ্ডারার গাড়ির ড্রাইভারকে নিয়ে। কিন্তু চট করে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। ড্রাইভার বাবুর বাড়ি থেকে টেলিগ্রাম এল, তার মার খুব অসুখ, তক্ষুনি বাড়ি যেতে হবে। রাঙাকাকাবাবুকে সন্ধ্যায় যখন বললাম ভাল খবর আছে, তিনি প্রথমটায় গম্ভীর হবার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত হেসে ফেললেন। (ক্রমশ)

এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় অভাবে পড়ে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের কাছে এলেন ৫০ ডলারের জন্যে। টাকাটা পেয়ে তিনি একপাতা সাদা কাগজ চাইলেন যাতে লিখে দেবেন যে, টাকাটা ধার হিসেবেই নিচ্ছেন তিনি। শুনে ফ্র্যাঙ্কলিন চেঁচিয়ে উঠে বললেন, "হ্যাঁ, টাকাটা তো গেছেই, আবার কাগজটাও যাক!"

একেবারে আলাদা জাতের সাবান লিরিল। সবুজ তরল—
লেবুর চনমনে সতেজতায় ভরা। ঝকঝকে চনমনে হ'তে লিরিল—
স্নানের পর আপনি হ'য়ে উঠবেন চনমনে এক অন্য মানুষ!

লিরিল
তরতাজা হবার সাবান

লেবুর মত চনমনে তরতাজা

লিন্টাস-LR.28-283 BG

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

রাজা-উজির

কাজি মুরশিদুল আরেফিন

হাকিমপুরের হাবা—
রাজা-উজির সঙ্গে নিয়ে
যাচ্ছে নাকি জাভা?

হাতি আছে, নৌকা আছে,
ঘোড়াও আছে দুটো,
সৈন্য আছে আটটা, তাতেই
ভর্তি হাতের মুঠো।

রাজা-উজির যাচ্ছে তবু
নেই যে কারও তাড়া,
হাকিমপুরের হাবা তাদের
দেয় না বিমান-ভাড়া।

ব্যাপারটা কী জানতে গেলে,
বলল সেদিন হাবা:
রাজা-উজির মিথ্যে তবু
তাদের নিয়েই ভাবা,
দাবা খেলার জন্যে কালই
রওনা দেব জাভা।

জোড়া মাস্টারি

বিশ্বরূপ মণ্ডল

রেল চলে ঝিকঝিক,
খুকু হাসে ফিকফিক,
বাপি বলে, অঙ্কটা
কষে দাও ঠিক-ঠিক।
কে যেন দেয়াল থেকে
লেজ নেড়ে টিকটিক,
সায় দেয়, অঙ্কটা
কষা চাই ঠিক-ঠিক।

ঝিক ঝিক ফিকফিক,
ঠিক ঠিক টিকটিক,
ভুল হলে অঙ্কটা
টিকটিকি দেবে ধিক,
থেমে যাবে রেলগাড়ি,
চলবে না ঝিকঝিক।

খুকুমণি, শোনো তাই
অঙ্কটা কষা চাই—
কষে ফেলে ঠিক-ঠিক
হাসো তবে ফিকফিক।

ছবি : সুনীল শীল

সদাশিব

দৌড়োদৌড়ি কাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ

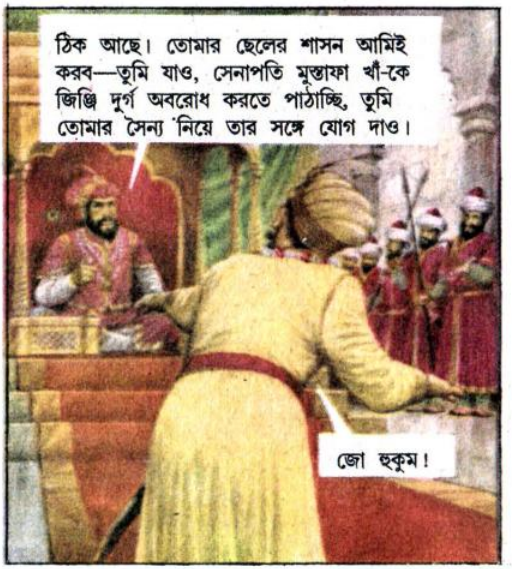

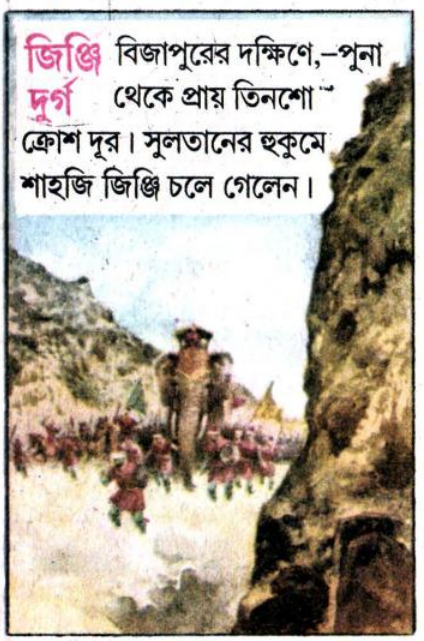

সাত হাজার সৈন্য নিয়ে তোর্নার দিকে যাত্রা করলেন সেনাপতি লিয়াকত খাঁ

ঘেরাও করলেন তোর্না দুর্গ।

কিন্তু বারুদের পিপেয় আগুন লাগিয়েই সদাশিব তাদের কী হাল করেছিল—সে গল্প এখন সবারই জানা।

এদিকে, তোর্না দুর্গে তখন খুশির জোয়ার...

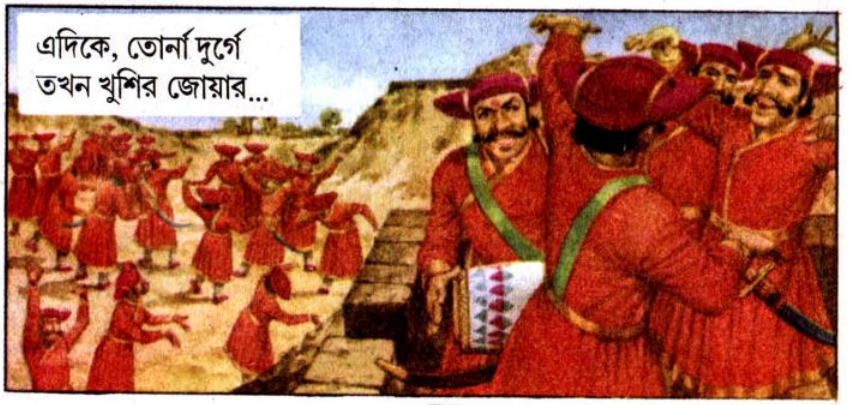

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

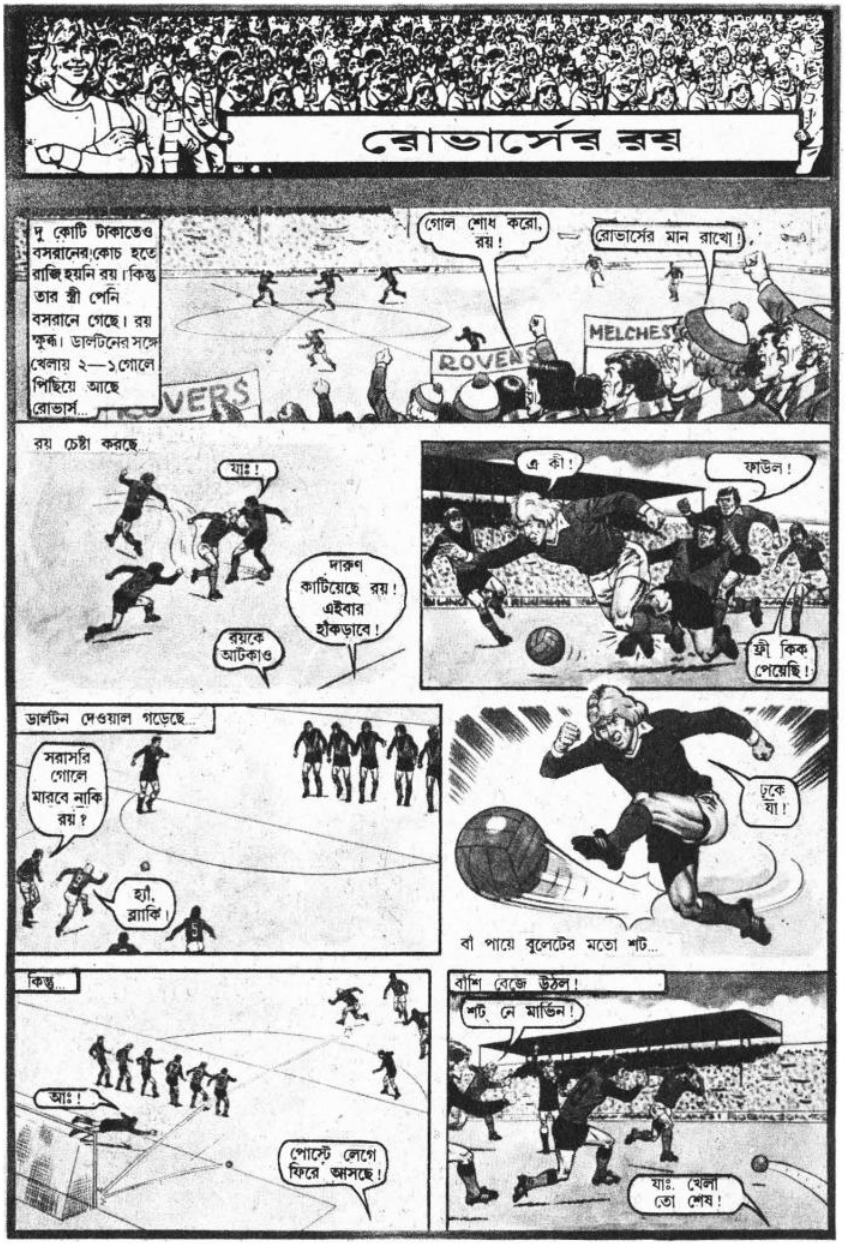
রোভার্সের রয়
দু কোটি টাকাতেও বসরানের কোচ হতে রাজি হয়নি রয়। কিন্তু তার স্ত্রী পেনি বসরানে গেছে। রয় ক্ষুব্ধ। ডালটনের সঙ্গে খেলায় ২—১ গোলে পিছিয়ে আছে রোভার্স...
গোল শোধ করো, রয়!
রোভার্সের মান রাখো!
ROVERS
MELCHESTER
রয় চেষ্টা করছে...
যাঃ!
দারুণ কাটিয়েছে রয়! এইবার হাঁকড়াবে!
রয়কে আটকাও
এ কী!
ফাউল!
ফ্রী কিক পেয়েছি!
ডালটন দেওয়াল গড়েছে...
সরাসরি গোলে মারবে নাকি রয়?
হ্যাঁ, ব্ল্যাকি!
ঢুকে যা!
বাঁ পায়ে বুলেটের মতো শট...
কিন্তু...
আঃ!
পোস্টে লেগে ফিরে আসছে!
বাঁশি বেজে উঠল!
শট নে মার্ভিন!
যাঃ, খেলা তো শেষ!

গোল শোধ হবার আগেই খেলা শেষ!
মার্ভিন রাগে ফেটে পড়েছে!
এখনও একটা খেলায় জিতিনি! তুমি বসরানেই যাও!
মার্ভিন!
তুমি বসরানে গেলেই আমরা বাঁচি!
কী বলছ?
রয়ও ক্রুদ্ধ... কিন্তু...
না না, আমার রাগ করা শোভা পায় না!
আমাকে ধৈর্য ধরতেই হবে!
রয়ের নীরবতার নানানরকম ব্যাখ্যা হচ্ছে...
মার্ভিনের কথার তো জবাব নেই!
রয়কে তাই চুপ করে যেতে হল!
বাড়িতে ফিরেছে রয়...
টেলিফোন বাজছে...
রয় ঠিকই ভেবেছে!
আরামাজ থেকে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান...
আরামাজ তো বসরানের রাজধানী নিশ্চয় পেনি!
এখানে আমরা দারুণ আনন্দে আছি।
সে তো বুঝতেই পারছি!
কী করবে এখন রয়?
রোভার্সের মায়া কাটিয়ে সে কি তাহলে বসরানেই চলে যাবে এবার?
এর পরে আগামী সংখ্যায়

?
সুড়ঙ্গ! মাটির নীচে দুর্গ!
এটা কী?
বাঙ্কার!...
এখান থেকে গুলি চালানো যায়!
বাপ্ রে! এ যে ম্যাজিনো লাইন!
হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ...
হ্যাঁচ্চো!
কে? কর্তা?
কর্তা নাকি?
হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ...
কেউ নেই! আশ্চর্য!
অথচ কে যেন হাঁচল!
হাত তোলো! নয়তো গুলি করব!
নড়বে না! খবদার!
এবারে চলো, আমিরের ছেলের কাছে আমাকে পৌঁছে দাও!
এই ঘরে রয়েছে তালা খুলে ঘরে ঢোকো!
বাস, এবারে একটু সরে গিয়ে হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকো!
আবদুল্লা, চটপট আমার সঙ্গে এসো, বাবার কাছে পৌঁছে দেব...
না না, বাবার কাছে যাব না। এ খুব মজার জায়গা। তুমি চলে যাও!
কিন্তু

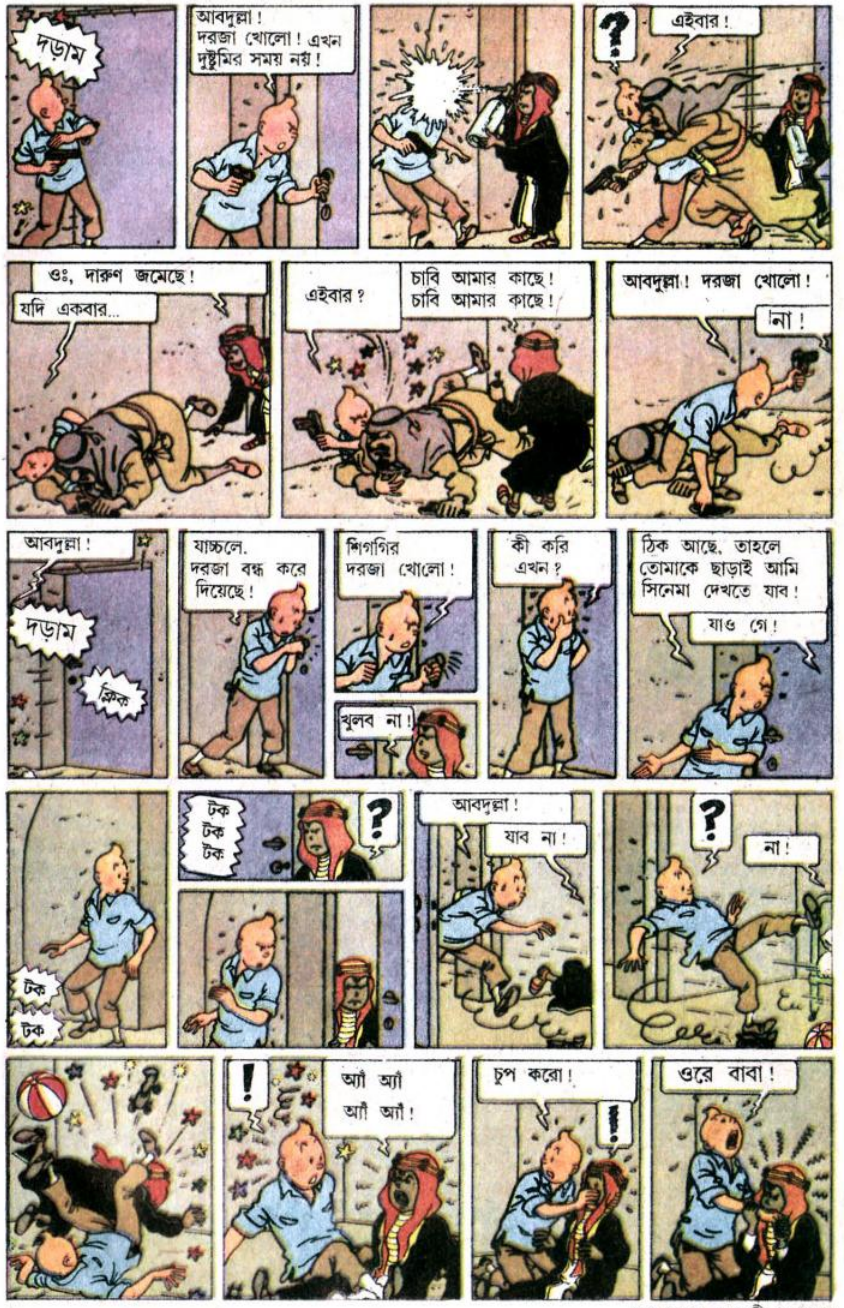

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

শব্দ-সন্ধান

১		■	২	৩		৪
					■	
৬					■	
■	৮	৯			১০	■
১১	■		■	■	১২	১৩
	■	১৪	১৫	■	■	
১৬				■	১৭	

সংকেত : পাশাপাশি : (১) ধীশক্তি। (২) আয়ুর্বেদ-চিকিৎসক। (৫) আগ্নেয় পর্বত থেকে নির্গত হয়। (৬) দৈত্যমাতা। (৮) রামায়ণোক্ত অসুর। (১২) দাবার মোক্ষম চাল। (১৪) যা থেকে রুপি বা টাকা। (১৬) কোন্ চিতা জন্তু নয়? (১৭) বার্তাবহ।

উপর-নীচ : (১) ফুলে সুগন্ধ, পাতায় অঙ্গসজ্জা। (২) চাঁদের ষোলো ভাগের এক ভাগ। (৩) সূর্য। (৪) শৃগাল। (৭) যাকে তাল করা উচিত নয়। (৯) বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একজন। (১০) বিখ্যাত পর্বত। (১১) অশ্বশালা। (১৩) অনুজ্জ্বল। (১৫) না থাকলে গাছ শোভাহীন।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

শু	গ	লি	■	কু	র	ঙ্গ
■	শু	■	■	■	ঙ্গ	■
না	র	দ	■	■	ন	ন
ম	■	রি	সা	লা	■	র
তা	কি	য়া	■	প	ল	ক
■	ম্ন	■	■	■	হ্	■
গা	র	দ	■	ম	■	ই

ধাঁধা

খেলাটা শুনতে দারুণ লাগে, কিন্তু নিজে যোগ দেওয়া কঠিন, বিশেষত আমার পক্ষে। ছোড়দি যখন 'সপ্তস্বর' বলছিল গড়গড় করে, তখনই আমি অবাক। সা রে গা মা বললে তবু চেনা যায়, তার বদলে ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম— এগুলো এই প্রথম শুনলাম।

সেজদাদুর বলার কথা, 'সপ্তপাতাল'। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে যেন নিজের মনেই সাজিয়ে নিল সেজদাদু, তারপর না-থেমে দিব্য বলে চলল—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল।

এর আগে ছোট্কা বলেছে, 'সপ্তদ্বীপ'। বাবা, 'সপ্তলোক'। তারপর গৌরীর ভাগে পড়েছিল—'সপ্তসমুদ্র'। এবার না আমায় কিছু জিজ্ঞেস করে বসে ছোটকা! সাত নিয়ে এই খেলায় সাতবার ঢোঁক গেলা ছাড়া আমার আর কীই বা বলার আছে।

নিজে ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে আছি, আবার অন্যরা যখন বলছে, দারুণ এনজয় করছি।

সেজদাদুর বলা শেষ। ছোট্কা বলল, "আর কী হয় সাত দিয়ে, আর কী হয়..." চোখটা যেন আমার ওপরেই এসে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, "সাত দিয়ে কোনও ধাঁধা হয় না ছোট্কা?"

ছোট্কা হেসে ফেলল, "সতুবাবুর কেবল ধাঁধার চিন্তা। এ কি ধাঁধার থেকে কম ইন্টারেস্টিং?"

গৌরী বলল, "সাত দিয়ে আমি একটা ধাঁধা বলতে পারি। সতু কি পারবে উত্তর দিতে?"

ছোট্কা বলল, "সতুবাবু উপলক্ষ হোক-না। সবাই শুনুক।"

গৌরীর বলা ধাঁধা দিয়েই এবার শুরু।

প্রথম ধাঁধা॥ একশো টাকাকে এমনভাবে সাতটা খামে ভাগ করে রাখতে হবে যে, এক থেকে একশো পর্যন্ত যত টাকাই দরকার হোক না কেন, খাম ধরে-ধরে তক্ষুনি দেওয়া যাবে। নতুন করে গোনাগুনির দরকার হবে না। এক বা একাধিক খাম দিলেই চলবে। বলতে পারো, কোন্ খামে কত রাখতে হবে?

দ্বিতীয় ধাঁধা॥ দুটো সংখ্যা যোগ করলে হয় ত্রিশ, সংখ্যা দুটো বিয়োগ করলে হয় আঠারো। সংখ্যাদুটো কী কী বলতে পারো?

তৃতীয় ধাঁধা॥ জট ছাড়াও—

নী লি মা মু নূ শু

গতবারের উত্তর॥ (১) ২২টি তুবড়ি। (২) বিভাবসু। (৩) (৫+৫) (৫+৫) = ১০০।

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল উটপাখির ফোটো
ফোটো : তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ বনের মধ্যে বসে আছি, হঠাৎ টের পেলাম একটা সিংহ নিঃশব্দে আমার পেছনে এসে ঘাড়ের ওপর নিশ্বাস ফেলছে। এ-অবস্থায় আমার কী করা উচিত ?

উঃ শার্টের কলারটা তুলে দেওয়া।

প্রঃ একটা ছেলে যে একা এতগুলো ভুল করতে পারে আমার ধারণাই ছিল না। ব্যাপারটা কী ?

উঃ একা নয় স্যার, আমার দিদি আমাকে সাহায্য করেছে।

প্রঃ তোমার পেট ভরে গেছে বলছ, ঠিক আছে, বাড়িতে খাবার জন্যে পকেটে করে কমলালেবু আর কেক নিয়ে যাবে তো ?

উঃ পকেটও যে আগেই ভরে গেছে।

প্রঃ মা'র মতো অ্যাত্ত বড় হয়ে তুমি কী করবে খুকি ?

উঃ ডায়েটিং।

প্রঃ আপনার অফিসে কতজন কাজ করে ?

উঃ আদ্দেকেরও কম।

সুসেন

মজার খেলা

যে-কোনও দশটা তাস নাও একটা তাসের প্যাকেট থেকে, তারপর নীচের ছবির মতো টেবিলে উলটে রাখো তাসগুলোকে—

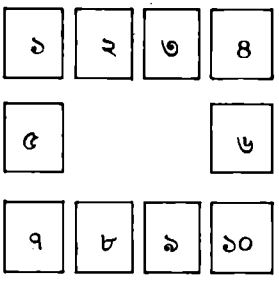

খেলাটা হল, ওলটানো যে-কোনও তাস থেকে শুরু করে পর পর দুটো তাস পার হয়ে যাবে, তারপর চতুর্থ তাসটাকে সোজা করে দেবে। এইভাবে সোজা করতে-করতে শেষ পর্যন্ত মাত্র একটি তাসই পড়ে থাকবে টেবিলে উলটোমুখী হয়ে, বাকি নটা তাস সোজা হয়ে যাবে।

খেলাটায় যেমন-তেমনভাবে করে গেলে শেষরক্ষা করা যাবে না। একটা নিয়ম আছে। যে-উলটানো তাস থেকে একটা দান শুরু করবে, পরের বার সেই তাসটাকে যেন সোজা করা যায় এমনভাবে দান শুরু করতে হবে, তাহলেই দেখবে চটপট-চটপট ন'খানা তাস শেষ পর্যন্ত সোজা হয়ে যাচ্ছে।

একটা দান বলে দিচ্ছি। ১ থেকে শুরু করো, ৪নং তাসটা সোজা করে দাও। পরেরবার ৮ থেকে ৭ ও ৫ পার হয়ে ১নং তাসটাকে সোজা করো। এইভাবেই, এর পর ৬-এ শুরু করে ৮, ২ থেকে ৬, ৭ থেকে ২, ১০ থেকে ৭, ৩ থেকে ১০, ৫ থেকে ৩ এবং ৯ থেকে ৫-এ যাও। দ্যাখো, শেষ পর্যন্ত নয়-সংখ্যক কার্ডটাই একমাত্র উলটোমুখী হয়ে থাকছে, আর বাকি নটা তাসই সোজা হয়ে গেছে। নিজে প্রথমে অভ্যেস করে নাও, পরে বন্ধুকে ডেকে খেলতে বলো।

মজারু

হাসিখুশি

"এই যে দাদা, কাছাকাছি কোনও পুলিশ আছে ?"

"পুলিশ ? এখানে ? এখান থেকে থানা মশাই তিন মাইল দূরে।"

"বাঃ, চমৎকার ! টাকা-পয়সা ঘড়িটড়ি যা-যা আছে ঝটপট সব দিয়ে দিন।"

"দ্যাখ্ তো, আকাশে মেঘ আছে কিনা, একটু বাইরে বেরোব।"

"ঠিক বোঝা যাচ্ছে না বাবু, আকাশটা একেবারে কালো হয়ে আছে।"

"কী ব্যাপার রতনবাবু, আপনার মাথায় টাক পড়ে যাচ্ছে যে।"

"আর বলবেন না, চিন্তায়।"

"কিসের চিন্তা ?"

"টাক পড়ে যাবার চিন্তায়।"

"জানিস, কাল সারারাত আমি একদম ঘুমোতে পারিনি।"

"কেন ?"

"কাল স্বপ্ন দেখলাম, আমি সারারাত জেগে বসে আছি, বসে বসে চোর তাড়াচ্ছি।"

"এই যে বুকুন, দুটো সর্বনামের উদাহরণ দাও তো দেখি।"

"স্যার, কে ? আমি ?"

"ভেরি গুড। সিট ডাউন।"

ছবি অহিভূষণ মালিক

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

টুপুরের গবেষণা

বিমান রাউত

গবেষণা বর্ণ নিয়ে। করেছে টুপুর। খুবই গোপন ছিল বস্তুটি। প্রকাশ করার ব্যাপারে ভীষণ বাধাও ছিল। কিন্তু সব ভাল যার শেষ ভাল। টুপুর একদিন নিজেই বলল, "তুমি এটাকে নিয়ে লিখতে পারো।" তাই তো পারছি তোমাদের জানাতে।

বর্ণ মানে রঙ নয়, বর্ণ মানে বাংলা ভাষার স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ। গবেষণা বর্ণ নিয়ে—লোকের নামের আদ্যক্ষর নিয়ে। আমি তো পুরোটা লিখতে পারব না। অসুবিধে আছে। আমি শুধু সারমর্মটুকু নিবেদন করছি।

ছোটপিসির বিয়ের নিমন্ত্রিতদের লিস্টি থেকে টুপুর সাঁইত্রিশজনকে বেছে নিয়েছিল। ছোটকার কাছে শোনা কথা—যাকে বলে 'টেস্ট স্যাম্পল'। নামের আদ্যক্ষরকে দু'ভাবে ভাগ করা হয়েছে, আর তাতেই টুপুরের হাতে স্বরবর্ণের লোক সসম্মান 'পাশ' এবং ব্যঞ্জনবর্ণীয়রা সত্তর ভাগ 'ফেল'। বড়মামুর ভাষায় 'ডিজাসট্রাস'। এই রিসার্চ শেষ করতে টুপুরের সময় লেগেছে পুরো তিনদিন। এবং খুব কষ্টও হয়েছে। বড়দের চোখ, বিশেষত ছোটকা কিংবা সেজদাদুর বাঘের মতো চোখ এড়িয়ে করতে হয়েছে কিনা। বর্ণবিদ্বেষের বর্ণনায় তাঁরা কাতর হতেন না হয়তো, কিন্তু বিশেষণ জুটত যে অনেক। 'পাকা', 'ডেঁপো' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এবার এই অমূল্য রিসার্চ কাকে দেখানো যায়? ওইখানেই টুপুর মুশকিলে পড়ল। কাকে দেখাবে? ছোটদের কি আর সুখের জায়গা আছে! বড়রা সবসময় যেন ইঁট সিমেন্ট খুরপি নিয়েই বসে আছে—পাঁচিল তোলার জন্য। 'এটা কোরো না', 'ছিঃ, এমন করে না', 'সাবধান, আরেকবার যদি দেখি তো কান ছিঁড়ে নেব' ইত্যাদি। আর কান ছেঁড়া বোধহয় ফুল ছেঁড়ার চেয়েও সহজ।

ভাবছে টুপুর—কে আছে বিশ্বস্তজন, যে

হাটে হাঁড়ি ভাঙবে না, টুপুরের এই রিসার্চ নিয়ে হাসাহাসি করবে না, গণ্ডগোল করবে না? আচমকা মনে হল সুলেখাদির কথা। যাকে 'মিষ্টিদি' বলে ডাকে টুপুর এখন—নীরজা মাসির মেয়ে। এম. এ. পড়ছে বাংলায়, চমৎকার মেয়ে, বয়সে বড় হলেও একেবারে বন্ধুর মতো। খুব পছন্দ হল টুপুরের, নামটা যদিও ব্যঞ্জনবর্ণের।

"তাই নাকি?" সুলেখা তো শুনে-টুনে লাফিয়ে ওঠে। "দেখা শিগ্‌গির। এ তো হৈচৈ ফেলে দেবে রে। দেখা, দেখা।" যেন তর সইছে না সুলেখার।

'অ' দিয়ে শুরু। অতীনদাদু। হাসলেই মনে হয় ঐরকম মানুষ হেডমাস্টারমশাই হলে বেশ হয়। স্কুলে না-যাবার ইচ্ছেটিচ্ছে তখন আর থাকে না। 'আ' দিয়ে আলো-মাসি। টুপুরকে একটা বিশ্ববিজ্ঞানের বই কিনে তাতে লিখে দিয়েছিল, "দেখলে প'ড়ে শিখবে, শিখলে, সোনা, লিখবে।" কী দারুণ, না? এ-মানুষ শুধু ভাল নয়, খুব মিষ্টি। তারপর ইলাপিসি। বৃষ্টির মতো কথা বলেন আর যখন-তখন টুপুরের জন্য তাঁর ব্যাগ থেকে ফশ করে বেরিয়ে পড়ে চকোলেট। উৎপলমামু—স্কুটার চড়া শুধু শেখাবে বলেনি, ডায়মণ্ডহারবার গিয়ে পিকনিক করার কথা দিয়েছে। ঊর্মিলা কাকিমা—টুপুরকে দিয়েছিল একটা ক্রিকেট ব্যাট। শুধু তাই নয়, 'টু আ প্রমিসিং ক্রিকেটার' এই কথাটা লিখিয়ে সই করিয়ে নিয়েছিল ব্যাটের ওপর আলভিন কালীচরণকে দিয়ে। ছোটকা অসীম তো টুপুরের ধ্যানজ্ঞান। একটু বকাঝকা করে—কিন্তু কত ধাঁধা দেয়, সিনেমা দেখাতে নিয়ে যায়, চারটে-পাঁচটা পেন দিয়েছে টুপুরকে।

ওদিকে ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যাপারটা দেখা যাক। ঠাসাঠাসি ভিড়। কিরণ রায়, টুপুরের বড় পিসেমশায়। দেখলেই বলেন 'এই যে শ্রীমান শালপাতা (ওটার যে কী অর্থ কে জানে) নেখাপড়া (গলাটাকে বিকৃত করা চাই তখন) চলছে কেমন? আচ্ছা বলো তো, নেবুক্যাডনেজারের গোঁফ ছিল কিনা?' ঐ লোককে ভাল লাগতে পারে? খগেনমেসো তো যেন গ্রামার বইয়ের ইজারা নিয়েছেন। ইজারার মানেটা ছোটকা শিখিয়ে দিয়েছে, কথাটা ছোটকাই ব্যবহার করেছে খগেনমেসো সম্বন্ধে। বদ্ধ পাগল না হলে বাবার মতো লোককে গ্রামার জিজ্ঞেস করতে পারে? মেসো একদিন নাকি বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "দাদা, বলুন তো, এগ্রিমেন্ট অব ভার্ব উইথ সাবজেক্ট ব্যাপারটা কী?" বাবা নাকি সেদিন প্রায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

চুনিলালদাদু তো আরো চমৎকার। টুপুরকে ডাকেন ছ্যামরা বলে। আগে টুপুরের ধারণা ছিল ছ্যামরা কোনো বিদেশী শব্দ। ল্যাটিন-ট্যাটিন হবে। পরে জেনেছে, বাঙাল ভাষায় ছ্যামরা মানে ছেলে। খালি জ্ঞান দেবেন। আর বলবেন, "নিজে হাতে এক গ্লাস জল নিয়ে আয়।" চাকরবাকরগুলোর নাকি ব্যারাম থাকে। 'ছ' দিয়ে ছানাকাকু। ছোট্‌কা আড়ালে বলে পুডিংদা। কথা বলতে শুরু করলেই জমে যায়। নট্ গোয়িং, নট নড়ন-চড়ন। পুলিশের লোক না হয়েও লোক যখন পুলিশ হয়, তখন ব্যাপারটা কীরকম দাঁড়ায়? ছানাকাকুর এক চোখ দেখতে থাকে টুপুরদের মানে টুপুর বা তার বয়সের বাচ্চাদের,

আর অন্য চোখ নজর রাখে বাড়ির বড়দের উপরে। উফ্, একটা হরিগুল (হরিবল গণ্ডোগোল—ছোটকার সন্ধি এটা) সৃষ্টি করে ছানাকাকু। ঠাকুমা পর্যন্ত ছানাকাকু এলেই বলেন, "ঐ এল খরখরেটা।"

তারপর জীবনদা। নানুপিসির ছেলে। কী দারুণ আবৃত্তি করে। ছবি আঁকতে পারে। কিন্তু সময়-সময় খালি স্কোয়ার কাট করার ঝোঁক। জীবনদার জানা কথা হলে সে আর কিছু শুনবে না, সপাটে কাট—মানে অন্যদের বক্তব্য। ধুস্—ভাল লাগে না। পঞ্চাশ-পঞ্চাশ ভাল-মন্দ সেই জীবনদাকে টুপুর কিন্তু ফেল করিয়ে দিয়েছে। পঞ্চাশ ভাগ মন্দ যে!

সুলেখা লিস্টিটা নামিয়ে রাখে। তারপর টুপুরের দিকে তাকিয়ে বলে, "টুপুর—তুই একটা জিনিয়াস।"

টুপুর বলে, "খুব বিচ্ছিরি?"

সুলেখা বলে, "মোটেই না। দারুণ। এটা সব্বাইকে ডেকে-ডেকে এনে পড়ানো উচিত্। টুপুর, এটাকে আমি নিয়ে নিলাম একজনকে পড়াব বলে। আমার মাস্টারমশাই। রিসার্চ তিনিও করছেন। দারুণ সমঝদার লোক। তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব; দেখিস তোর ভাল লাগবে। তবে কী জানিস টুপুর, তোর রিসার্চকে কাকতালীয় না বলে অভাবনীয় বলব। শোন্, 'নামে কী আসে যায়' কথাটা কে বলেছে জানিস? এক বিখ্যাত কবি; নাম, শেক্সপীয়ার। গোলাপকে যে-নামেই ডাকো, গোলাপ গোলাপই। আবার এও সত্যি, ছোটবেলায় যাদের তোর ভাল লাগছে না, বড় হয়ে কিন্তু তাদেরই খুব ভাল লাগতে পারে। সব তখন পালটে যেতে পারে। আসলে আমরা বড়রা অনেক সময় ভুলে যাই যে, ছোটরা ছোটদের মতো কথা শুনতে ভালবাসে। সেটাই যাকে বলে হরিগুলে ব্যাপার।

"যাকগে সেসব কথা—এই রিসার্চের জন্য তোর একদিন চাইনিজ খাওয়া পাওনা রইল। যাব শুধু আমি সুলেখা চৌধুরী, তুই অনির্বাণ রায়, আর আমার মাস্টারমশাই—ব্যঞ্জনবর্ণের একজন, শ্রীবিবস্বান্ চট্টোপাধ্যায়। কী বলিস, রাজি? বর্ণ বিভাগে ২—১ হলেও আমার বিশ্বাস, ভোজটা ভালই জমবে।"

প্রতিযোগিতার ফলাফল

"কলকাতা সম্পর্কে তোমরা কি ভাবছো" এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় যারা পুরস্কার পেয়েছো তাদের আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আশা করি কলকাতাকে নিয়ে যে সব চিন্তা ভাবনা তোমরা তোমাদের লেখায় প্রকাশ করেছো, জীবনের চলার পথেও সেগুলো মনে রাখবে। আমাদের মনোনীত ১৩ জনের নাম ও ঠিকানা নীচে দেওয়া হলো। আর যারা পুরস্কার পাওনি, কিন্তু অংশ গ্রহণ করেছিলে তাদের প্রত্যেককে জানাই আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা। কারণ পুরস্কারের চেয়েও বড় কথা হ'লো কলকাতা সম্পর্কে তোমাদের সচেতনতা। যা তোমাদের লেখায় সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

১। তারকনাথ দাস, যাদবপুর

২। কল্লোল কুমার হালদার, ডায়মণ্ডহারবার

৩। রাজকুমার চক্রবর্ত্তী, উত্তরপাড়া

৪। সুর্মা দত্ত, নৈহাটী

৫। আনন্দ ব্যানার্জী, রাজপুর, ২৪-পরগণা

৬। মনোজিৎ পাল,
পোঃ—বহরমপুর, জিলা—মুর্শিদাবাদ

৭। সঞ্জয় ব্যানার্জী, কলিকাতা-৭

৮। উজ্জয়িনী বোস, আলিপুর কোর্ট, জলপাইগুড়ি

৯। সব্যসাচী রায়, কলিকাতা-২

১০। ভাস্কর নারায়ণ চৌধুরী, কলিকাতা-৭৫

১১। রূপালী ব্যানার্জী, সন্তোষপুর, কলিকাতা-৭৫

১২। মধুমিতা দত্ত, বারুইপুর

১৩। সুব্রত বাগচী, হাওড়া-৩

(জনসংযোগ বিভাগ, সি, এম, ডি, এ ৩এ অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

বন্ধু বুলবুলি

আমি যখন সকালে পড়তে বসি তখন একটা বুলবুলি পাখি আমাদের জানলার সামনের ইলেক্‌ট্রিক তারের ওপর এসে বসে, আর মিষ্টি সুরে শিস দিয়ে ডাকে। আমার খুব ইচ্ছে করে, ওই রকম করে শিস দিতে। কিন্তু আমি চেষ্টা করেও তা পারি না।

আমি তখন 'বুলবুলি, ও বুলবুলি' বলে ডাকি, পাখিটা ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকায়। ওর সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব পাতিয়ে নিয়েছি।

একদিন দেখি যেই বুলবুলিটা তারের ওপর এসে বসেছে অমনি কোথা থেকে একটা কাক উড়ে এসে ওকে ঠোকরাতে লাগল। তাই দেখে আমার কাকটার ওপর খুব রাগ হল। দেখি আর একটা বুলবুলি পাখি উড়ে এসে কাকটাকে ঠোকরাতে লাগল। দুটো বুলবুলির সঙ্গে একটা কাক লড়াই করতে পারল না। একটু পরে পালাল। আনন্দে আমি হাততালি দিয়ে উঠলাম। সেই থেকে আমরা তিনজনে বন্ধু হয়ে গিয়েছি।

সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত (বয়স ১০)

আমাদের কথা

আমার দাদু খুব ভাল। আমার ঠাকুমা খুব কালো। আমার বাবা লম্বা। আমার মা বেঁটে। আমার দাদার নাম গৌতম। দাদার অনেক গল্পের বই আছে। দাদা বই পড়ে। আমার অনেক পুতুল আছে। আমি পুতুল খেলি।

মিমি আদিত্য (বয়স ৯)

ছয় ঋতু

গ্রীষ্মকালে দুপুর বেলায় রৌদ্র করে ঝাঁ-ঝাঁ,
বর্ষাকালে ঝমঝমাঝম মেঘবৃষ্টি রাজা।
শরৎকালের আকাশে ভাসে পেঁজা তুলো,
হেমন্তের শিশির ছোঁয়ায় মনটা হল ভুলো।
শীতকালের পিঠে-পুলি বড়ই লাগে ভাল,
বসন্তেই ডাকে কোকিল রঙটি যার কালো।

অরুণিমা চট্টোপাধ্যায় (বয়স ১১)

খাদের মধ্যে

সে-দিনটার কথা আমার মনে আছে। বাড়িতে লোক এসেছে, তাদের খাবার আনতে দোকানে যাচ্ছিলাম। সামনে একটা মাঠ, মাঠে নামতেই অন্ধকার নেমে এল। হঠাৎ মনে হল, পথ আর ফুরোচ্ছে না। এমন সময় কে যেন আমায় নাম ধরে ডাকল। সেই ডাক শুনে ঢুকলাম একটা পোড়ো বাড়িতে।

ওই বাড়িটার মধ্যে পাঁচটা ডাকাত একটা ছোট ছেলেকে ধরে রেখেছিল। ডাকাতগুলো আমাকে দেখেই তাড়া করল। আমি পালাতে লাগলাম। সামনে একটা খাদ পড়ল, এক লাফে সেটা পেরুতে গিয়ে পড়ে গেলাম খাদের মধ্যে। আমার মাথায় খুব লাগল।

তারপর চোখ খুলে দেখি, আমি বাবার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছি। আমার বোন আমাকে হাওয়া দিচ্ছে। আমার কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতে বাবা বললেন, "তুই ঘুমের মধ্যে খাট থেকে পড়ে গিয়েছিলি।"

অতনু দত্ত (বয়স ১২)

দুষ্টু ছেলে

এক যে ছিল দুষ্টু ছেলে
চড়ত গিয়ে গাছে,
মারত ঢিল গাছের থেকে
পেত যাকে কাছে।
একদিন সে দুষ্টু ছেলে
ভাঙল হাতখানা,
বন্ধ হল গাছে চড়া
বন্ধ দস্যিপনা।

লোপামুদ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ১০)

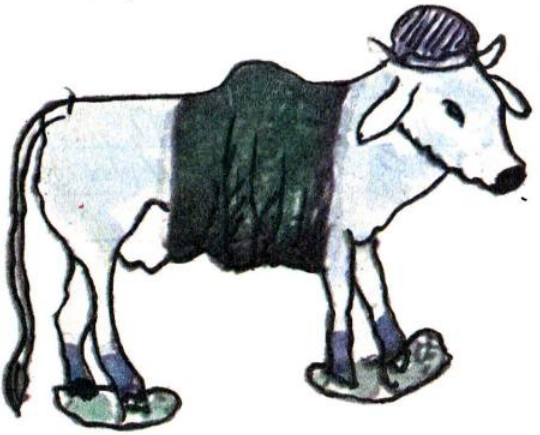

এক যে ছিল

এক যে ছিল গরু
সন্ধেবেলায় মেঘ ডাকলেই
নাচ করত শুরু
তার গায়ে সাটিন জামা
তার মাথায় জরির টুপি
পায়ে মজার জুতো
চলত চুপি-চুপি

ছড়া ও ছবি ঃ
শোভজিতা মজুমদার

কাকের বাসা

নীলাঞ্জনা গঙ্গোপাধ্যায় (বয়স ৭)

একদিন আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি, নিমগাছে কাকের বাসায় একটা কাক বসে আছে। কাকটা একবার একটু উঠেছিল। তখন দেখি বাসায় হালকা নীল রঙের তিনটে ডিম।

কাকটা পর-পর কয়েকদিন ডিমের ওপর বসেই থাকল। ঝড়বৃষ্টিতেও বাসা ছেড়ে উঠল না। একদিন দেখি, ডিম ফুটে তিনটে ছানা বেরিয়েছে। ওদের মুখের ভেতরটা কী লাল! ওরা কা-কা করে খাবার জন্য। ওদের মা খাবার এনে খাওয়ায়। ওরা বড় হয়ে একদিন উড়ে গেল।

ছবি ঃ বিশ্বরূপা দত্ত (বয়স ৬)

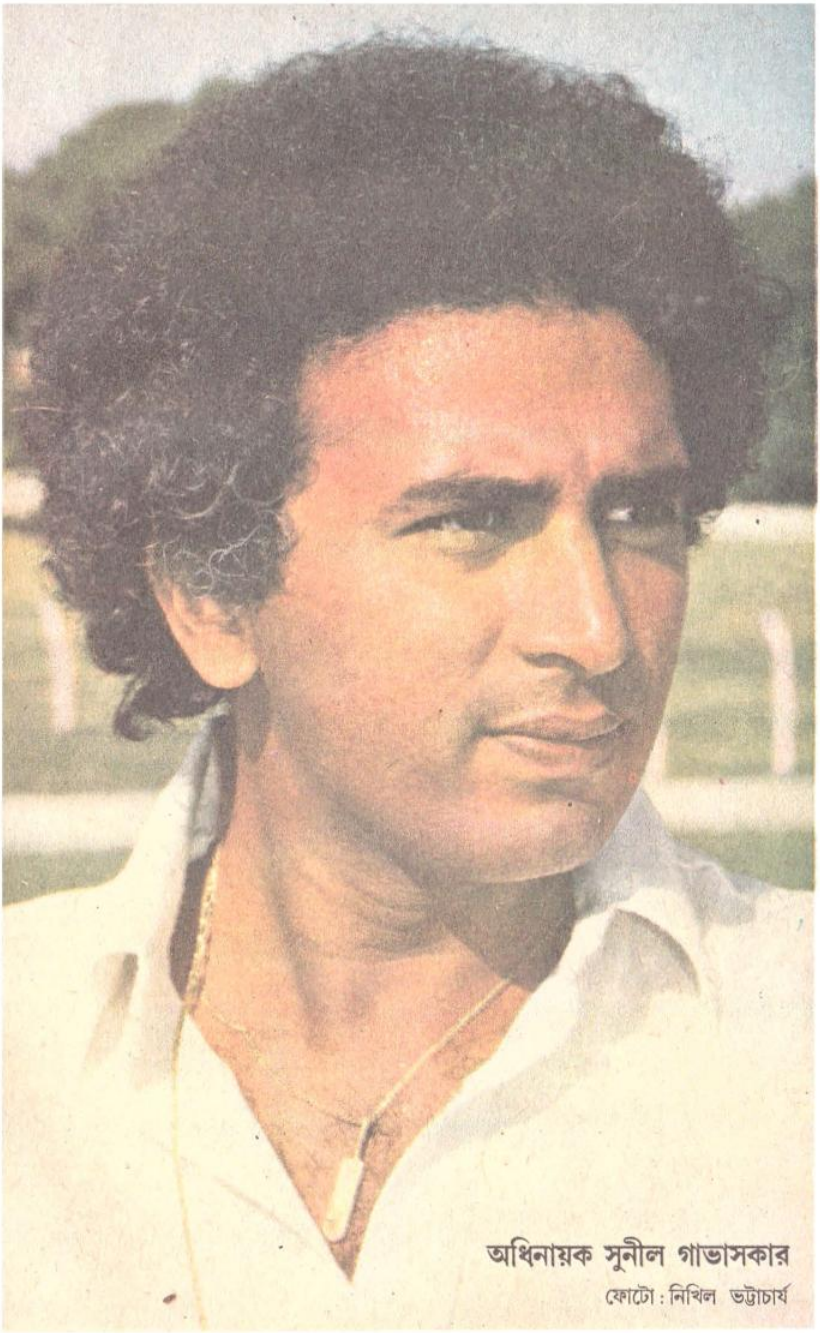

অধিনায়ক সুনীল গাভাসকার

ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

রান চাই, আরও রান

পল্লব বসুমল্লিক

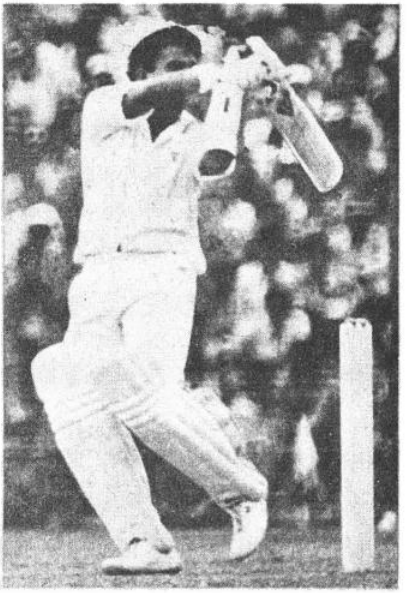

ইংল্যাণ্ড ক্রিকেট দলের ভারত-সফর তখনও শুরু হয়নি। হায়দরাবাদে বর্ষণমুখর এক সন্ধ্যায় তাঁর মুখোমুখি হলাম। ক্রিকেট-অনুরাগীদের অসংখ্য প্রশ্ন, ভাবনা আর আশঙ্কার কথা তাঁকে জানালাম।

পোশাকি নাম সুনীল মনোহর গাভাসকার, সংক্ষেপে 'সানি' গাভাসকার আমার মুখের কথাটুকু কেড়ে নিলেন। তারপর ব্যাটিংয়ের সময় উইকেটের চারধারে যে-ভাবে প্রচুর নয়নাভিরাম বাউণ্ডারি মারেন, ঠিক সেইভাবে আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলেন। "আমি জানি, আমার অসংখ্য গুণগ্রাহী হতাশায় ভুগতে শুরু করেছেন। তবে চিন্তার কিছু নেই, বর্তমান অবস্থাটা সাময়িক।" একটা গভীর আত্ম-সমীক্ষার সুর সানির কণ্ঠে।

"গত বছর একটা অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ করলাম আমার মধ্যে। সমারসেট কাউন্টি দলের হয়ে ইংল্যাণ্ডে খেলার পর থেকে আমি হয়ে উঠলাম একজন আক্রমণাত্মক ওপেনিং ব্যাটস্‌ম্যান। যে ধৈর্য আর একাগ্রতা আমার মধ্যে ছিল, তা হারিয়ে যেতে থাকল। কী দুর্বিষহ অবস্থা একবার ভাবোতো। ব্যাটে রান না পেলে মনে হয় সব কিছুই যেন ভুল করছি।"

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড সফরের পর দেশে ফিরে এসে বেশ কিছুদিন ভাবার সময় পেয়েছিলেন সুনীল। তাঁর ব্যাটিং এবং অধিনায়কত্বের দোষত্রুটি নিয়ে একটা সমীক্ষা চালালেন তিনি। কিথ ফ্লেচারের ইংল্যাণ্ড দলটির মোকাবিলা করতে তিনি প্রস্তুত। বললেন, "ইংল্যাণ্ডের দলটির শক্তি সম্বন্ধে আমরা ওয়াকিবহাল। অস্ট্রেলিয়াকে স্বদেশে হারানোর পরে ওদের স্পিরিট এখন তুঙ্গে। দলে অভিজ্ঞ এবং নবীন খেলোয়াড়রা আছেন। তবে আসন্ন যুদ্ধের জন্য আমাদের দলের সবাই প্রস্তুত।"

সানি জানালেন, ব্যাটিং শিখতে হলে জিওফ

বয়কটের খেলা মন দিয়ে দেখতে হবে। লড়াই করার অনমনীয় স্পৃহায় এই সিরিজে যিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবেন, তিনি হলেন বিশ্বের অন্যতম সেরা অল-রাউনডার ইয়ান বথাম। তোমাদের ভাল লাগবে ডেভিড গাওয়ার, গ্রাহাম গুচ আর মাইক গ্যাটিংয়ের ব্যাটিং। বব উইলিস আর ডেরেক আনডারউড ইংল্যাণ্ডের বোলিংয়ের প্রধান দুই অস্ত্র।

গাভাসকারের বিশ্বাস, গত দুটি সফরের কথা ভুলে গিয়ে তাঁর দলের সবাই দেশের মাটিতে দারুণ লড়বেন। এই লড়াইতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় দেখা যাবে কপিলদেব, সন্দীপ, চেতন এবং বিশ্বনাথকে। দর্শকদের মন মাতাবেন বেঙ্গসরকার, যশপাল এবং কিরমানি। সানি নিজেও এবার অনেক রান পাওয়ার আশা রাখেন।

সুনীল বাংলা বোঝেন, একটু-আধটু বলতেও পারেন। ছেলেবেলায় তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন কয়েকটি বাঙালি পরিবার। সন্দেশ, মিষ্টি-দই আর কলকাতার মানুষ সুনীলকে এখনও বারবার টানে। দর্শকদের হাততালি তাঁকে জানিয়ে দেয় তাঁর কত রান হল। ব্যাটিংয়ের সময় তিনি কখনোই স্কোর বোর্ডের দিকে তাকান না। কলকাতায় আর একটি সেঞ্চুরি করে আশি হাজার দর্শকের অভিনন্দন তিনি এবারও পেতে চান।

আর একটা কথা। তোমরা যারা তাঁকে চিঠি দিয়েছিলে, সেসব চিঠি তিনি পেয়েছেন। তোমাদের অনুপ্রেরণা তাঁকে শক্তি দেয়। কেমন করে জানো? সে উত্তর তিনি দেবেন তাঁর পরবর্তী আত্মজীবনীমূলক বইতে। হ্যাঁ, 'সানি ডেজ'-এর পরবর্তী অংশ লিখতে শুরু করেছেন সুনীল। আর, ১৯৭৮-এ পাওয়া সব চিঠির উত্তর দিচ্ছেন এখন এই হিসেবে তোমরা হয়তো তোমাদের চিঠির উত্তর পাবে ১৯৮৩ সালে। কিংবা এমনও হতে পারে, তোমরা তোমাদের চিঠির উত্তর পাবে সুনীলের খেলায়। কারণ, তোমাদের সকলের চিঠির বক্তব্যই প্রায় এক : সানি, রান চাই, আরও রান!

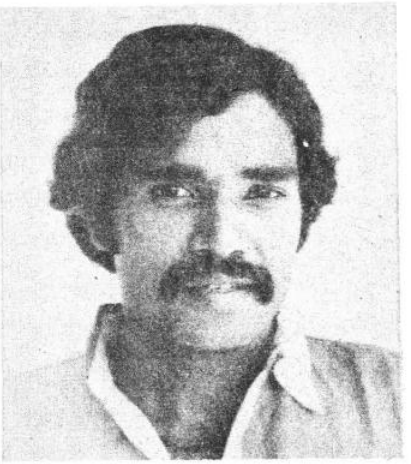

সি ডি ফ্রানসিস

ইস্টবেঙ্গলের বাহাদুরি

বজ্রসেন

এই পত্রিকার আগের সংখ্যাতেই লিখেছিলাম, শীল্ডের যুগ্মজয়ে অতৃপ্ত মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল পরস্পরকে খুঁজে বেড়াবে, এবং কোথাও না কোথাও তাদের দেখা হয়ে যাবেই। এই লিখেই শেষ করেছিলাম 'কেউ জেতেনি, কেউ হারেনি'। ঠিক ওইখান থেকেই শুরু করছি। দেখা হয়ে গেল শৈলশহর দার্জিলিংয়ে—মাত্র আট দিন পরেই—সপ্তম অল-ইণ্ডিয়া ব্রিগেড অব গোর্খাজ গোল্ড কাপের ফাইনালে। নাটকীয়ভাবে জয়ী হল ইস্টবেঙ্গল, ৩—২ গোলে। নর্থ পয়েন্টে সেন্ট জোসেফ'স কলেজের মাঠে তথা গোল্ড কাপ প্রতিযোগিতায় এবং পশ্চিমবাংলায় এই মরসুমে এটাই মোহনবাগানের প্রথম হার। অপরদিকে ইস্টবেঙ্গল তিন বছরে প্রথম কোনও ট্রফি জিতল (বলা বাহুল্য, এই হিসেবের মধ্যে যুগ্মজয়কে গণ্য করা হয়নি।) তাই ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের উচ্ছ্বাস সঙ্গত কারণেই কিছুটা মাত্রাছাড়া হয়েছে। মহাষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বিস্তর বাজি পোড়ানো হয়েছে। ওদিকে,

তনুশ্রীর রূপে লাবণ্য ঝরে লাক্সেরই যত্নে
LUX
PINK
নাচের ছন্দের তালে তালে তনুশ্রী শঙ্করের লাবণ্যের
দীপ্তি তাঁকে অপরূপা করে তোলে। ওঁর এই
লাবণ্যময়ী রূপ অপরূপা থাকে লাক্সেরই যত্নে।
উনি বলেন —"আমার রূপ-লাবণ্য কোমল আর
সুন্দর রাখতে আমি রোজই লাক্স মাখি!"
Tanusree Shankar
শুদ্ধ, স্নিগ্ধ লাক্স—
চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য সাবান।
হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেডের উৎকৃষ্ট উৎপাদন
HLL-5402

মোহনবাগানের সমর্থকরা কিছুটা বিমর্ষভাবেই পুজো কাটাল।

কিন্তু এ-কোন্ মোহনবাগানকে হারিয়েছে ইস্টবেঙ্গল? মোহনবাগান তো মোটেই পূর্ণশক্তিতে খেলতে পারেনি। সুব্রত, মিহির, কম্পটন, পায়াস, সুদীপ পিয়ং ইয়ংয়ে এক অখ্যাত আধা প্রতিযোগিতায় আটকে। শ্যামল ব্যানার্জি মারডেকা থেকে ফিরেছে আঘাত নিয়েই। শীল্ড ফাইনালে জামশেদের সঙ্গে সংঘর্ষের পর শিবাজির পাঁজরের দুটি হাড়ে চিড়। সমরের জ্বর, বিশ্বজিৎ বসুও আহত। উলাগাকে ছেড়ে দিতে হল এশিয়ান গেমসের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রস্তুতি শিবিরের জন্যে। এই অবস্থায় মোহনবাগানের দার্জিলিং যাওয়ার প্রশ্ন ছিল না। তারা যেতেও চায়নি। ক্লান্ত, আহত খেলোয়াড়দের বিশ্রাম প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু বিশ্রাম তাদের ভাগ্যে ছিল না। 'মোহনবাগান যাবে না'—এই খবর পেয়ে দার্জিলিংয়ে উদ্যোক্তাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল—বিক্ষুব্ধ মোহনবাগান সমর্থকরা টিকিটের দাম ফেরতের দাবি তুললেন। উদ্যোক্তারা ধরলেন মুখ্যমন্ত্রীকে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, মোহনবাগান বৃহস্পতিবার ১ অক্টোবর বিমানে যাবে। কিন্তু যেতে হল ট্রেনে। শুক্রবার পৌঁছবার দু-ঘণ্টা পরেই এরিয়ানের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল (২—১), শনিবার বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের বিরুদ্ধে সেমি-ফাইনাল (২—০) এবং রবিবার অর্থাৎ ৪ অক্টোবর ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ফাইনাল। নিঃসন্দেহে অমানুষিক ব্যাপার! এবং, মোহনবাগানকে তার জনপ্রিয়তার মাশুল দিতে হল।

ইস্টবেঙ্গলের কৃতিত্বকে অবশ্য বিন্দুমাত্র ছোট করে দেখছি না। শুধু বলছি, মোহনবাগানের চেয়ে অনেক ভাল অবস্থায় থেকে তারা ফাইনাল খেলেছে। ইস্টবেঙ্গলের দু-জন মাত্র পিয়ং ইয়ংয়ে ছিলেন—মনোরঞ্জন এবং অমলরাজ। আহতের তালিকাটিও লম্বা ছিল না।

মোহনবাগানের বিরুদ্ধে এটা ছিল ইস্টবেঙ্গলের এ-মরসুমের পঞ্চম সাক্ষাৎকার! ফেডারেশন কাপের সেমি-ফাইনালে (০—২, ০—০) এবং লীগে (০—১) হারার পর শীল্ডের নাটকীয় ড্রয়ের (২—২) পর এই জয়কে কী বলব? অতিনাটকীয়? হয়তো ওটাই

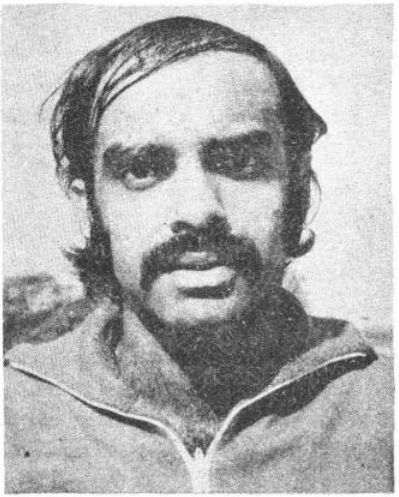

প্রদীপ চৌধুরী

উপযুক্ত বিশেষণ! মনে রাখতে হবে মাত্র নয় মাসের মধ্যে এই চতুর্থবার ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের বিরুদ্ধে পিছিয়ে গিয়েও খেলা বাঁচাল এবং জিতল! গত রোভার্স কাপ সেমি-ফাইনালে দু-দিনেই ইস্টবেঙ্গল পিছিয়ে পড়েছিল, কিন্তু ০—২ ও ০—১-কে তারা ২—২ ও ২—১ করে নেয়। আর এবারের আই এফ এ শীল্ডের ঘটনা তো এখনও পুরনো হয়ে যায়নি! ওই ফাইনালটিতেও খেলা শেষ হওয়ার ত্রিশ সেকেণ্ড আগে ডি'সুজা গোল না করলে ০—১ থেকে ২—১ করে শীল্ড ঘরে তুলছিল ইস্টবেঙ্গল। আর গোল্ড কাপ ফাইনালে সাতাত্তর মিনিট পর্যন্ত দু'গোলে পিছিয়ে থাকা ইস্টবেঙ্গল শেষ তেরো মিনিটে তিনটি গোল করে মোহনবাগানকে হারাল। এটা যদি বাহাদুরি না হয় তবে বাহাদুরি কাকে বলে আমাদের জানা নেই। সন্দেহ নেই, ইস্টবেঙ্গলের কাজ সহজ হয়ে গিয়েছিল ক্লান্ত, বিধ্বস্ত মোহনবাগানকে পেয়ে। কিন্তু সে যা-ই হোক, এরপরও কি কখনও মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারবে?

বিশেষ বাহাদুরি সোমনাথ ব্যানার্জির। তিনিই দলের তৃতীয় ও জয়সূচক গোলটি করেছেন। পাঠকদের নিশ্চয়ই মনে আছে, এবারের শীল্ডের সেমি-ফাইনালে মফতলালের

বিরুদ্ধে এবং ফাইনালে গোল শোধ করে ইস্টবেঙ্গলকে খেলায় ফিরিয়ে এনেছিলেন এই সোমনাথই।

ইস্টবেঙ্গল এই প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই ভাগ্যদেবীর বিশেষ কৃপা লাভ করেছে। কোয়ার্টার-ফাইনালে সিমলার গোর্খা ব্রিগেডের (১—০) এবং সেমি-ফাইনালে নর্থ-বেঙ্গল সাব-এরিয়ার (২—০) বিরুদ্ধে খেলেছিল ইস্টবেঙ্গল। প্রথম খেলাটিতে দারুণ চাপের মুখে ইস্টবেঙ্গল জিতেছে নেহাতই ভাগ্যের জোরে। দ্বিতীয় খেলাতে বিশ্বজিৎ ও শঙ্কর সাহা ভাল না খেললে বিপদে পড়ত ইস্টবেঙ্গল। দুটি খেলারই প্রথমার্ধ গোলশূন্য ছিল। ওদিকে, দুর্ভাগ্য মোহনবাগানকে যেন কলকাতা থেকেই তাড়া করেছিল। তা না হলে মোহনবাগানের তথা এবারের গোল্ড কাপ প্রতিযোগিতার অবিসংবাদিত নায়ক শ্যাম থাপা ফাইনালে আহত হয়ে মাঠ ছাড়েন!

শ্যাম যতক্ষণ মাঠে ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ততক্ষণ গোল করতে পারেননি। শুধু তাই নয়, তিনদিনই শ্যাম গোল করেছেন। এরিয়ানের বিরুদ্ধে দুটি। সেদিন তিনি একরকম দর্শকদের অনুরোধেই ব্যাকভলি করে প্রথম গোলটি করেন। দার্জিলিংয়ে শ্যাম খুব জনপ্রিয়। প্রিয় দর্শকদের সামনে প্রিয় মাঠে প্রিয় দলের এই হারে শ্যাম ব্যথিত। দুঃখ করে বলেছেন, "আমি মাঠে থাকলে এই ম্যাচ কিছুতেই হারতাম না।" সুধীর কর্মকারও দারুণ খেলেছেন, বিশেষত ফাইনালে। সুরজিৎ সেনগুপ্ত এবং প্রাক্তন ওলিমপিয়ান চন্দন সিংয়ের মতে ফাইনালের ম্যান অব-দা-ম্যাচ পুরস্কারটি সি ডি ফ্রানসিসের বদলে সুধীরেরই পাওয়া উচিত ছিল। বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল দলের শঙ্কর সাহা এবং ফরিদও ভাল খেলেছেন। মোহনবাগানের আর দুই চিরতরুণ গৌতম ও প্রদীপ চৌধুরীও তাঁদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

সব শেষে বলি, এবারের গোল্ড কাপ স্মরণীয় হয়ে থাকবে নানা কারণে। যখন "পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে/শূন্যে আর রসাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে" তখন দারুণ ফুটবল খেলেছিল ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান।

ইস্টবেঙ্গলের দুঃস্বপ্ন

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ভারতের মাটিতে সর্বাধিক কত গোল হয়েছে তা জানার জন্যে গত অক্টোবরের ২৬ তারিখে এ-দেশের ক্রীড়া-সাংবাদিকরা হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কারণ সন্ধ্যাতেই খবর এসেছিল, ডি সি এম প্রতিযোগিতার পুলের তৃতীয় খেলাটিতেও ইস্টবেঙ্গল হেরেছে, এক বিদেশী ইস্টের কাছে— অস্ট্রেলিয়ার ইস্ট ফ্রিম্যান্টল ট্রাইকালার এস সি (সংক্ষেপে ই এফ টি) — ০—৫ গোলে। আগের দুটি খেলায় পাঞ্জাব স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড এবং পাঞ্জাব পুলিশের বিরুদ্ধেও ইস্টবেঙ্গল হেরেছিল, ১—২ ও ০—২ গোলে।

পাঁচ গোলে ইস্টবেঙ্গল এর আগেও হেরেছে। ভারতেই। সেটা বড় কথা নয়। কথা হল, গোল্ড কাপ পাওয়ার পরে ইস্টবেঙ্গল জ্বলে উঠতে পারল না।

এর কারণ কী? দলে অনেক খেলোয়াড় ছিলেন না। মনোরঞ্জন, ফরিদ, ও 'সি ডি' ভারতীয় দলের প্রয়োজনে অন্যত্র। শেখরন, বিশ্বজিৎ ও অনুদেবের চোট। কিন্তু তবুও ইস্টবেঙ্গল ভাল করতে পারত যদি মজিদ ও জামসিদ সব খেলায় খেলতেন। কিন্তু পাঞ্জাব রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের বিরুদ্ধে ছাড়া ওঁদের আর নামানো হয়নি। 'শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে'। ওদের দু'জনের বক্তব্য অবশ্য অন্যরকম। এটা স্পষ্ট যে, অন্তর্কলহের জন্যে ইস্টবেঙ্গলের টীম স্পিরিট নষ্ট হয়ে গেছে। তাই তিনটি খেলায় নটি গোল খেয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল লীগে কোনও পয়েন্ট না করেই ইস্টবেঙ্গল বিদায় নিল ডি সি এম থেকে। দীপাবলীর আলোকের ঝর্নাধারা সদস্য-সমর্থকদের কাছে হয়ে গেল অশ্রুর বন্যা। এবারের ডি সি এম সমর্থকদের কাছে এক দুঃস্বপ্ন।

সে যা-ই হোক, এবারের ডি সি এম

প্রতিযোগিতা নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা করার আগে একটি প্রশ্ন রাখতে চাই। ভারতের শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা কোন্‌টি?

উত্তরটা একই রকম না হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেউ বলবেন, রোভার্স কাপ, আবার কারও মতে ডুরাণ্ড কাপ। আমার ভোটটি কিন্তু পড়বে ডি সি এমের পক্ষে। কারণ, এতে ভারতের প্রথম সারির সব দল (মোহনবাগান বাদে) অংশ নেয়ই, উপরন্তু গত তেরো বছর ধরে প্রায় প্রতিবারই দুটি বিদেশী দল থাকে। ওই সব দলের প্রতিটিই অসাধারণ না হলেও ভারতীয় দলগুলির চেয়ে তারা প্রায়ই ভাল খেলে। ইরানের তাজ ক্লাব, উত্তর কোরিয়ার এপ্রিল ২৫ ইয়ংমেন এফ সি, ডক রো গাং, দক্ষিণ কোরিয়ার হ্যান ইয়াং বিশ্ববিদ্যালয়, ন্যাশনাল সিটিজেনস ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অব সিওল, সোভিয়েত ইউনিয়নের স্পার্টাক, ভোল্‌গাকিলানিন, মিউনিখের বেয়ারিশার এফ ভি— এই সব দল বিদেশ থেকে এসে ডি সি এম ফুটবলকে আকর্ষণীয় করেছে। এতগুলি বিদেশী দল এ পর্যন্ত আর কোনও ভারতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়নি। এর আগে দু'বার ফাইনালে দু'দিক থেকেই বিদেশী দল উঠেছিল। এবারও তাই হল। দক্ষিণ কোরিয়ার মাইয়ুং জি বিশ্ববিদ্যালয় ৩—১ গোলে অস্ট্রেলিয়ার ইস্ট ফ্রিম্যান্টল ট্রাইকালার এস সি-কে হারিয়ে ১৯৮১-র ডি সি এম কাপ পেল।

কোয়ার্টার ফাইনালের পুল 'এ'-তে ছিল মাইয়ুং জি, জে-সি-টি, বি-এস-এফ ও মফতলাল। পুল 'বি'-তে ইস্ট ফ্রিম্যান্টল ট্রাইকালার (ই এফ টি), পাঞ্জাব পুলিশ, পাঞ্জাব স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড ও ইস্টবেঙ্গল। মাইয়ুং জি প্রতিযোগিতার গোড়া থেকেই চমৎকার খেলে বি-এস-এফ-কে ৪—০ ও জে-সি-টিকে ২—০ হারিয়ে এবং মফতলালের সঙ্গে ০—০ করে পুল চ্যাম্পিয়ন হয়। তিনটি খেলায় চার পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় হয় জে-সি-টি। একই ভাবে পুল 'বি'-র শীর্ষস্থানটি নেয় ই এফ টি— তিনটি খেলা থেকে পাঁচ পয়েন্ট পেয়ে— ও দ্বিতীয় স্থানটি পায় পাঞ্জাব পুলিশ চার পয়েন্ট পেয়ে। সেমি-ফাইনালে মাইয়ুং জি হারায় পাঞ্জাব পুলিশকে (১—০) এবং একদিন খেলা অমীমাংসিত (১—১) থাকার পর ই এফ টি হারায় জে-সি-টিকে (২—০)।

ছবির মজা

পাতা মুড়িবেন না

এখন তো সার্কাসের সময়। তা বলো তো, ক, খ আর গ, কোন্‌ পথে গেলে ওরা সার্কাসে পৌঁছতে পারবে।

হারানো কাকাতুয়া

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে: গবা কি সত্যি পাগল? উদ্ধববাবুর কেনা কাকাতুয়া বলে, "আলমারিতে টাকা নেই, অন্য জায়গায় আছে।" পাখিটিকে অনেকেই হাতাতে চায়। উদ্ধবের ছেলে রামুর নতুন গৃহশিক্ষক যুধিষ্ঠির জর্দাপান খায়। গবার ঘরে মধ্যরাতে যে ঢুকেছিল, তার মুখেও জর্দার গন্ধ। কাশিমের চরে হরিহর পাড়ুই খুন হয়। খুনের মামলার জেল-পালানো আসামি গোবিন্দ সার্কাসে ছদ্মবেশে খেলা দেখাত, পুলিশের সন্দেহ জাগায় সে গা ঢাকা দেয়। গবার মাধ্যমে রামু তার সন্ধান পাবার পরে গোবিন্দর গোপন আশ্রয়ে আগুন লাগে। গোবিন্দ বেঁচে গিয়ে গবার সাহায্যে উদ্ধবের বাড়িতে কাজ পায়। ব্যাপারটা কেউ জানে না। উদ্ধবের লোভী কর্মচারী নয়নকাজলকে দলে টেনে ইতিমধ্যে কাকাতুয়ার সঙ্গে রামুকেও লুঠ করেছে ডাকাত সাতনা। সেখানে সাংকেতিক গান গেয়ে ডাকাতদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে, তারপর মরতে-মরতে ফিরে আসে। গোবিন্দকে এদিকে যুধিষ্ঠির জানায় যে, সে নিহত হরিহরের ছেলে। ওদিকে অনুতপ্ত নয়নকাজল রামুকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। পালাবার সময়ে একটা ভাঙা-বাড়িতে রামু এক কাপালিককে দেখতে পায়। কেউ তাদের পিছু নিয়েছে। তারপর...

॥ ২৭ ॥

রামু বলল, "বড্ড হাঁফিয়ে গেছি।"

নয়ন বলল, "আমিও। এসো, বসে একটু জিরিয়ে নিই।"

"জিরোবে! কিন্তু কে যে আসছে পেছনে।"

ফিসফিস করে নয়ন বলে, "আসছে আমাদের পায়ের শব্দ শুনে-শুনে। নইলে এই জঙ্গলে আমাদের পিছু নেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। যদি বসে থাকি, তবে আমাদের পায়ের শব্দও হবে না, আর লোকটাও খুঁজে পাবে না আমাদের।"

বলতে-বলতে নয়ন বসে দম নিতে থাকে। রামুও। পিছনে পায়ের শব্দটাও আর হচ্ছে না।

রামু জিজ্ঞেস করে, "আমরা কতদূর এসেছি নয়নদা?"

"তা কী করে বলব? এ-জায়গা আমার চেনা নয়। জঙ্গলটাও ভারী জটিল। শুনেছি পুবধারে একটা দুর্ভেদ্য বাঁশবন আছে। সেই বন এত ঘন যে, শেয়ালও গলতে পারে না।"

"আমরা কি সেদিকেই যাচ্ছি?"

"তাও জানি না। আমরা খুব বেশি দূর আসতে পারিনি। ছুটবার সময় ডাকাতদের রাতপাহারার একটা হাঁক-ডাক শুনতে পেলাম যেন।"

রামু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তাহলে চলো, আর-একটু দূরে যাই।"

নয়ন তার হাতখানা ধরে বসিয়ে দিয়ে কাহিল গলায় বলল, "খামোখা হয়রান হয়ে লাভ কী? গোলকধাঁধায় পড়ে আবার হয়তো গিয়ে ডাকাতদের আড্ডায় হাজির হতে হবে। তার চেয়ে বসে থাকো। ভোর হলে আলোয়-আলোয় চলে যাব।"

রামু জিজ্ঞেস করে, "কাপালিকটাকে দেখলে?"

"ভাল করে দেখিনি। যা ভয় পেয়েছিলাম।"

রামু একটা শ্বাস ফেলে বলল, "বিশাল চেহারা। হাবভাব দেখে মনে হল সাতনাও ওকে খাতির করে।"

"তা হলে ও হল সাতনার ওপরের সর্দার। এ-দলে যে কে কোন্ পোস্টে আছে, তা বলা মুশকিল।"

"তান্ত্রিক কাপালিকরা কি ডাকাত হয়?"

"হতে পারে। তা ছাড়া আসল কাপালিক কি না তাই দ্যাখো, ভেকও ধরে থাকতে পারে।"

যেখানে তারা বসে আছে, সে-জায়গাটায় গাছপালা তেমন ঘন নয়। শীতে গাছপালার পাতা ঝরে এমনিতেও একটু হালকা হয়েছে জঙ্গল। অন্ধকারে গাছপালা চেনা যায় না, তবে এখানকার গাছগুলো সবই বড়-বড়। ঝোপঝাড় তেমন নেই। লম্বা ঘাসের জঙ্গল আছে অবশ্য। তারা তেমনি বুকসমান ঘাসের মধ্যেই বসে আছে। হাত বাড়ালে একটা শিশুগাছের গুঁড়ি ছোঁয়া যায়।

হঠাৎ রামু বলল, "একটা শব্দ পেলে নয়নদা?"

নয়ন একটু শক্ত হয়ে গেল। তারপর

ফিসফিস করে বলল, "হ্যাঁ, একটু-একটু পাচ্ছি। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কেউ আসছে।"

রামু বলল, "আসছে নয়, এসে গেছে। ওঠো নয়নদা, ছোটো।"

প্রাণের দায়ে নয়ন উঠল। কিন্তু ছুটতে গিয়েই ঘটল বিপদটা। কোত্থেকে একটা খেঁটে লাঠি ছিটকে এসে তার দুই পায়ের মধ্যে একটা ডিগবাজি খেল। তাইতে নয়ন পড়ল উপুড় হয়ে। আর একটা খেঁটে লাঠির পাল্লায় পড়ে রামুও চিতপটাং।

শিশুগাছের পিছন থেকে লোকটা ধীরে-সুস্থে বেরিয়ে এল। হাতে বল্লম। অন্য হাতে নড়া ধরে প্রথমে রামুকে দাঁড় করাল। ছোট্ট একটা চড় তার গালে কষিয়ে গমগমে গলায় বলল, "পালাতে চাইবে আর? ওই খেঁটে লাঠির ক্ষমতা জানো? এককালে ঠ্যাঙাড়ে ঠগিরা ওই দিয়ে দূর থেকে লোককে ঘায়েল করত। ফের যদি পালাও তো পাবড়া দিয়ে ঠ্যাং ভেঙে দেব।"

রামুর অবশ্য পালানোর মতো অবস্থা নয়। চড়টা খেয়ে তার মাথা ঘুরছে। সে উবু হয়ে বসে পড়ল।

নয়নকাজল আর ট্যাঁফোঁ করল না। শোয়া অবস্থাতেই লোকটার পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, "আজ্ঞে আর পালাব না।"

লোকটা দুজনকে পাশাপাশি বসিয়ে নিজেও মুখোমুখি বসল। অন্ধকারে আবছা যা দেখা যায়, তাতে বোঝা যাচ্ছে লোকটার বয়স বেশি নয়। হালকা-পলকা চেহারা বটে, কিন্তু গায়ে বেশ জোর রাখে। পরনে মালকোঁচা মারা ধুতি, গায়ে একটা বালাপোশের খাটো কোট, পায়ে নাগরা।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, "কোথায় পালাচ্ছিলে তোমরা?"

নয়ন মাথা চুলকে বলল, "ঠিক পালাচ্ছিলাম না।"

"তাহলে কি এত রাতে জঙ্গলে বেড়াতে বেরিয়েছিলে?"

নয়ন একগাল হেসে বলল, "আজ্ঞে অনেকটা তাই। দিনকাল ভাল নয়। চারদিকে চোর-ছ্যাঁচড়ের উৎপাত। তাই চারদিকটায় একটু নজর রাখছিলাম আর কী।"

"এই জঙ্গলে চোর-ছ্যাঁচড় কী করতে

মাথার চামড়া শুকিয়ে যাওয়া মানে আপনার চুলেরও দফারফার শুরু...

চুল ওঠার সমস্যার মূল কারণ রয়েছে মাথার চামড়াতে। সুতরাং মাথার ওপরের এই চামড়ার যদি ঠিকমত পুষ্টিসাধন না করেন তো, সেটি শুকিয়ে খস্‌খসে হয়ে অপুষ্ট হয়ে পড়বে। আর তার ফলে মাথায় খুস্‌কি হতে থাকবে, চুল চিরে-চিরে যাবে ও নিষ্প্রভ, নির্জীব হয়ে পড়বে...

আর সেই কারণেই আপনার দরকার বিশেষ ফর্মুলায় বানানো এমন এক হেয়ার টনিক যা মাথার এই চামড়া শুকিয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করতে পারে।

HTM-PIL-2639-1

(পরের পৃষ্ঠাটি পড়ুন)

আসবে?" লোকটা একটু অবাক গলায় জিজ্ঞেস করে।

নয়ন বিগলিত হয়ে বলে, "বলা তো যায় না আজ্ঞে। আমাদের আড্ডায় তো মেলাই দামি জিনিস আছে।"

লোকটা এবার একটু আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে, "তোমাদের একটা আড্ডা আছে নাকি এখানে? তা সে আড্ডাটা কোথায়?"

নয়ন ব্যাপারটা বুঝতে না-পেরে ঘন ঘন মাথা চুলকোতে থাকে। রামু বলে, "কেন, আপনি কি সাতনা ডাকাতের আড্ডা চেনেন না?"

লোকটা এবার উৎসাহে একহাত এগিয়ে আসে। চাপা গলায় বলে, "আরে, আমিও যে সেই আড্ডাটাই খুঁজতে বেরিয়েছি। জায়গাটা কোথায় বলো তো?"

রামু মাথা নেড়ে বলে, "তা আমরাও জানি না। আমরা সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি। জঙ্গলের রাস্তা চিনি না। ফিরে যাওয়ার পথ বলতে পারব না।"

লোকটা বলে, "তোমরা পালিয়ে এসেছ কেন? তোমাদের কি ওরা ধরে রেখেছিল?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার নাম কি রামু, উদ্ধববাবুর ছেলে তুমি?"

"হ্যাঁ।" রামু ভয়ে ভয়ে বলে।

লোকটা একটু হাসে। বলে, "আচ্ছা কাণ্ড যা হোক। আমি তো ভেবেছিলাম তোমরা ওদের দলেরই লোক।"

"আপনি কে?"

"আমাকে চিনবে না। আমি ডাকাতদের দলে নাম লেখাতে যাচ্ছি।"

নয়ন ফস করে বলে ওঠে, "সে তো আমিও গিয়েছিলুম। কিন্তু ওরা নতুন লোককে সহজে দলে নেয় না।".

লোকটা খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে, "নেবে। এলেমদার লোক দেখলে ঠিকই নেবে। তোমরা যদি কেবল পথটা বাতলে দিতে পারতে, তাহলে আমার অনেক হয়রানি কমে যেত।"

নয়ন একটু গুম হয়ে থেকে বলল, "আপনি কেমন লোক কে জানে। খুব ভাল লোক যে নন তা বোঝাই যাচ্ছে। লোক আমিও ভাল নই। তাই আপনাকে বলতে বাধা নেই, আমার মনে হচ্ছে এই পশ্চিম দিকে নাক-বরাবর এগোলে সেই আড্ডায় পৌঁছে যেতে পারবেন। তবে সাবধান, আচমকা বল্লম এসে বুকে বিঁধতে পারে। মাথায় লাঠি পড়তে পারে কিংবা ঘাড়ে রামদায়ের কোপ। ওরা বাইরের লোক পছন্দ করে না।"

লোকটা হেসে বলল, "কিন্তু তুমি তো ওদের দলের লোক।"

"না, আমি দল ছেড়ে পালাচ্ছি।"

"তাই কি হয়?" বলে লোকটা সাদা দাঁতে হাসতে-হাসতে উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, "তোমরা পালালে আমার এত পরিশ্রমই বৃথা যাবে। আমি তোমাদের ধরে আবার সাতনার আস্তানায় নিয়ে যাব। চলো।"

নয়ন ভয়ে আঁতকে উঠে বলল, "বলেন কী? এই তো গত পরশু সাতনার এক কসাই আমাকে বিষ-বিছুটি দিয়ে ঝেড়েছে। আবার সেখানে যাব?"

রামুও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলে, "আপনি ডাকাত হতে যাচ্ছেন তো যান না, আমাদের টানছেন কেন?"

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, "তোমাদের ধরে নিয়ে গেলে সাতনা চট করে আমার ওপর খুশি হয়ে যাবে। তাছাড়া দলের ঘাঁতঘোঁতও কিছু

তোমাদের কাছে জানার আছে আমার। আর দেরি করে লাভ নেই। ওঠো, উঠে পড়ো।"

নয়ন লোকটার পায়ে ধরার চেষ্টা করল। রামুও কাঁদো-কাঁদো হয়ে অনেক কথা বলল। কিন্তু লোকটার নরম হওয়ার নাম নেই। খেঁটে লাঠিদুটো বগলে নিয়ে বল্লম বাগিয়ে সে একটা পেল্লায় ধমক দিয়ে বলল, "নাকি কান্না বন্ধ করো। তোমাদের এত সহজে ছাড়ছি না।"

অগত্যা বল্লমের মৃদু খোঁচা খেতে-খেতে জনে ম্লানমুখে লোকটার আগে-আগে পশ্চিমদিকে হাঁটতে লাগল।

বেশি দূর হাঁটতে হল না। আধ-মাইলটাক যেতেই অন্ধকারে বিশাল বাড়িটা দেখা গেল। আর দেখা গেল মশাল হাতে বিশ-ত্রিশজন লোক ছোটাছুটি হাঁকাহাঁকি করছে।

লোকটা বলল, "ওই বোধহয় সেই আড্ডা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। যমদুয়ার।" নয়ন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে।

আচমকা পিছন থেকে লোকটা একটা অমানুষিক "রে-রে-রে-রে" হাঁকাড় ছাড়ল। সে এমন শব্দ যে, মাটি কেঁপে ওঠে, গাছপালা নড়তে থাকে, দুর্বল লোকের হৃদ্‌পিণ্ড থেমে যায়। কোনো কথা নয়, শুধু "রে-রে-রে-রে" শব্দ বজ্রনির্ঘোষের মতো বেজে ওঠে।

সেই শব্দে মশালগুলো স্থির হয়ে দাঁড়াল। তার পর ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল।

(ক্রমশ)

মণিমেলার খবর

গত ১৫ অক্টোবর থেকে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত মহাকেন্দ্রের চারদিনব্যাপী এক শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল হাওড়া জেলার জুজারসাহা প্রাণনাথ মান্না বিদ্যানিকেতনে। ৬৫ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে এই শিবিরে বিশেষভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে শ্রীসুবোধ ভট্টাচার্য, শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামচন্দ্র মান্না, শ্রীহারাধন ভট্টাচার্য, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অংশ গ্রহণ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীসনৎকুমার পাঁজা ও শ্রীপরেশচন্দ্র কোলে।

আর এটা হ'ল মাথার চামড়া শুকিয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর উপায়...

ভেসলীন হেয়ার টনিক অ্যাণ্ড স্কাল্প কণ্ডিশনার অত্যন্ত খাঁটি ও পুষ্টিগুণে ভরপুর। এটি এমন তরল ও পাতলা যে কয়েক ফোঁটা মাথায় ছড়ালেই সরাসরি মাথার চামড়ার গভীরে প্রবেশ করে সারা মাথার চামড়ার পুষ্টিসাধন করবে।

ফলস্বরূপ : স্বাস্থ্যকর, পুষ্টিযুক্ত চামড়া...যা হ'ল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ঘন চুলের মূল আধার।

আরও কি, ভেসলীন হেয়ার টনিক অ্যাণ্ড স্কাল্প কণ্ডিশনার আপনার চুলকে রাখে চিকন ও পরিপাটি—সর্বদাই।

ভেসলীন®

হেয়ার টনিক অ্যাণ্ড স্কাল্প কণ্ডিশনার

প্রতিটি ফোঁটাই চামড়া শুকিয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করে।

HTM-PIL-2639-2

আধখানা ভূত

সুনীল জানা

অনেক রাত হয়েছে। হয়তো এগারোটা। নয়তো বারোটা। কে জানে, একটাও হতে পারে। একটা বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে রাধাকান্তবাবু বাড়ি ফিরছেন। ফিরছেন দিব্বি হেলতে-দুলতে। পেটটি বেশ ভারী। মনটাও খুব খুশি। খেয়ে-দেয়ে একসঙ্গে পাঁচটা পান মুখে পুরেছিলেন। এখনো সমানে চিবিয়ে যাচ্ছেন। মাঝে-মাঝে ঢেকুর তুলছেন। আর মনে মনে হিসেব করছেন, কী কী পড়ে রইল পাতে। এদিকে রাত কত হল, বাবুর সে হিসেব নেই।

অত রাতে রাস্তাঘাট বিলকুল ফাঁকা। একেবারে খাঁ-খাঁ করছে। করবেই তো। রাস্তার লোকজন সবই তো আর বিয়ের নেমন্তন্ন পায়নি। তারা কখন যে-যার বাড়িতে ডাল-চচ্চড়ি খেয়ে মনের দুঃখে ঘুমিয়ে পড়েছে। রাধাকান্তবাবুর গোলগাল চেহারা, ফিনফিনে ধুতি-পাঞ্জাবি, চকচকে সোনার বোতাম, বাঁ হাতে বেলফুলের মালা দেখার জন্যে একটাও লোক নেই কোথাও।

নেই তো নেই, রাধাকান্তবাবুর তাতে বয়েই গেল। তিন টাকার বই উপহার দিয়ে তিনি কমসে কম তেত্রিশ টাকার খাবার খেয়ে নিয়েছেন। মনে মনে খাবারের দামগুলো যোগ দিতে দিতে তিনি গুটি-গুটি হাঁটছিলেন, পাড়ার মোড়ে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আচ্ছা, অত বড় সাইজের সন্দেশগুলোর দাম কত হবে? পঞ্চাশ পয়সা? নাকি এক টাকা? এক টাকা হলে তো কথাই নেই। তাহলে আরো গোটা দশেক টাকা বেড়ে গেল যোগফলে। রাধাকান্তবাবুর ফুর্তি তখন দেখে কে!

আচ্ছা, মাংসটা বেশি ভাল হয়েছিল? নাকি দইমাছটা বেশি ভাল? সে-কথা ভাবতে-ভাবতে রাধাকান্তবাবু গলির মোড় ঘুরেছেন, বাড়ির সামনেই চলে এসেছেন প্রায়। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, "এই যে আধাকান্তবাবু!"

কে বলল? কী বলল যেন? গাধাকান্তবাবু?

তাই যেন শুনলেন মনে হচ্ছে। তবে রে! এত রাতে কার এত সাহস যে তাঁর নাম নিয়ে ভ্যাংচায়! নিঝুম পাড়া কাঁপিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি হুঙ্কার ছাড়লেন, "কে রে?"

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন তখন রাধাকান্তবাবু। চোখ পাকিয়ে এদিক-ওদিক সামনে-পেছনে তাকাচ্ছেন। কই, কারুর টিকিটা পর্যন্ত কোথাও দেখছেন না তো। নেহাত মনের ভুল কি না—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছেন তিনি। এবার তাঁর কানের পাশেই কে যেন ফিসফিস করে বলে উঠল, "একটু আস্তে চেঁচান, আধাকান্তবাবু। পাড়ার কুকুরগুলো জেগে যাবে যে।"

সঙ্গে-সঙ্গে তড়াক করে পাশ ফিরলেন রাধাকান্তবাবু। আর পাশ ফিরেই বেজায় আঁতকে উঠলেন। এটা আবার কী রে বাবা—কে রে বাবা! এমন বিদঘুটে বিতিকিচ্ছিরি চেহারা তিনি জন্মেও দেখেননি। যেমন লিকলিকে হাড্ডিসার চেহারা, তেমনি কালো কুচকুচে তার রঙ। মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া নোংরা চুলের জঞ্জাল। চুলের ফাঁক দিয়ে ইয়া গোল-গোল চোখ দুটো ড্যাব্‌ড্যাব করে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। মানুষের মতো দেখতে কী রে এটা? রাধাকান্তবাবু তাকে দেখে ভয় পাবেন কি পাবেন না, কিছুতেই ঠিক করতে পারছেন না। ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে আছেন তো তাকিয়েই আছেন। শেষকালে সেই মূর্তিটাই তখন হাতজোড় করে বলল, "নোমোস্কার! আমাকে চিনতে পার?"

রাধাকান্ত কলের পুতুলের মতো মাথা নাড়তে লাগলেন। তোতলামি করতে-করতে বললেন, "তো-তো-তু-তু-তুমি কে-কে-কে হে?"

মূর্তিটা ভারী অবাক হয়ে বলল, "সে কী গো আধাকান্তবাবু? আমার কথা ভুলেই গেছ?"

রাধাকান্ত একটু কেসে গলাটা একটু গম্ভীর করে বললেন, "আ-আ-আমার নাম আ-আ-আধাকান্ত নয়, রা-রা-রাধাকান্তবাবু।"

শীত পড়ে গেল

অন্য যে-কোনো ঋতুর চেয়ে এখনই আপনার বেশী দরকার

কেয়ো-কার্পিন ম্যাসাজ অয়েল

ত্বকের সম্পূর্ণ সুরক্ষায় অপরিহার্য

অন্য যে-কোনো ঋতুর চেয়ে শীতেই আপনার ত্বক স্পর্শ-কাতর হয়ে ওঠে বেশী। উত্তুরে হাওয়ার প্রকোপ ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। বাচ্চা আর শিশুরাই হয় বেশী আক্রান্ত-গায়ের চামড়া হয়ে ওঠে শুকনো, ফাটা-ফাটা আর খসখসে। শীতের মাসগুলোয় ত্বকের এইসব সমস্যায় একমাত্র সুরাহা কেয়ো-কার্পিন ম্যাসাজ অয়েল। এতে আছে ত্বকের স্বাস্থ্য রক্ষায় অপরিহার্য তিনটি প্রয়োজনীয় ভিটামিন (ই,এ এবং ডি)।

শীতে কেয়ো-কার্পিন ম্যাসাজ অয়েল নিয়মিত ব্যবহার করলে ত্বকের খসখসে, ফাটা-ফাটা ভাব দূর হবে, আর ত্বকের চেহারাও হয়ে উঠবে রেশমের মতো মসৃণ।

কেয়ো-কার্পিন ম্যাসাজ অয়েল। শীতে আপনার সঙ্গী আপনার ছেলে-মেয়ের ও পরিবারের সকলের সঙ্গী।

মোলায়েম বেস-নির্ভর এতে আছে অলিভ অয়েল, ল্যানোলিন ও চন্দন তেল

Dey's

দে'জ এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

৬০ ও ১৮০ এম.এল. প্যাকে পাবেন

শুনে মূর্তিটার খিকখিক করে সে কি হাসি! হাসতে-হাসতে সে বলতে লাগল, "জানি-জানি খুব জানি। তোমার এ জন্মের নাম রাধাকান্তবাবু, গত জন্মের নাম কৃষ্ণকান্তবাবু। আমার সব মনে আছে। কিন্তু এ-জন্মে তোমার নাম হওয়া উচিত ছিল আধাকান্তবাবু—তাই না?"

"কেন?" রাধাকান্ত এবার সত্যি চটে গেলেন। চটে গেলে তাঁর আর জ্ঞান থাকে না, তোতলামিও থাকে না। হেঁড়ে গলায় তিনি ধমকে উঠলেন, "রাতদুপুরে ইয়ার্কি হচ্ছে আমার সঙ্গে? আমার নাম আধাকান্ত হবে কেন শুনি?"

"বা রে! তুমি আধখানা মানুষ যে। পুরো মানুষ তো নও।"

"তার মানে? আমি আধখানা মানুষ মানে? তোমার বেয়াদপি তো কম নয়।" রেগেমেগে রাধাকান্ত তাকে এই মারেন তো সেই মারেন আর কি!

রাধাকান্তকে আধখানা মানুষ বলা সত্যি-সত্যি বেয়াদপির কথা বৈকি। গায়ে-গতরে ওজনে যিনি কম করেও গোটাচারেক মানুষের সমান, তাকে কি না আধখানা মানুষ বলা! রাধাকান্তবাবু এখন চটবেন না তো আর চটবেন কখন?

মূর্তিটা কিন্তু একটুও ঘাবড়াল না। লম্বা-লম্বা লিকলিকে হাত দুটো নাড়াতে-নাড়াতে বলল, "আহা-হা, অত চটো কেন? আমি কি ভুল বলেছি? হিসেব করে দ্যাখো না। এই তুমি হলে আধখানা, আর এই আমি হলাম আধখানা—যোগ করে তো আস্ত একখানা মানুষ পেয়ে গেলে। আবার কী?"

খুব সোজা অঙ্ক। কিন্তু রাগের চোটে রাধাকান্তবাবুর মাথায় কিচ্ছু ঢুকছিল না। রাগ সামলাতে তিনি সামনের রকটাতেই ধপ্ করে বসে পড়লেন। কিম্ভূত মূর্তিটার দিকে কটমট করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কে হে তুমি গুরুমশাই? চেহারাটা তো দেখছি একেবারে ভূতের মতন।"

মূর্তিটা অমনি হি-হি করে হাসতে লাগল। হাসতে-হাসতে বলল, "কী যে বলো! ভূতের মতন হতে যাব কেন? আমি তো ভূতই। ভূতের চেহারা ভূতের মতন হবে না তো কি—"

"অ্যাঁ—ভূ-ভূ-ভূ-উ-উ-ত!"

ব্যস, রাধাকান্তবাবুর তোতলামি আবার আরম্ভ হয়ে গেল। রকটার উপর প্রায় মূর্চ্ছো যেতে যেতে তিনি বলার চেষ্টা করতে লাগলেন, "রা-রা-রা-রা-আ-আ-"

মূর্তিটা এবার হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, "আরে-আরে,রাম নাম করে আমাকে আর ভয় দেখাতে হবে না। নিজেই ভয়টা একটু কমাও তো দেখি। আমি তো বাপু তোমারই ভূত। আমাকে আবার ভয়টা কী?"

রাধাকান্ত কোনোরকমে কঁকিয়ে-কঁকিয়ে বলতে লাগলেন, "আ-আ-আমার ভূ-ভূ-ভূত কেন? আ-আ-আমি তো মরিনি।"

"কী মুশকিল! আগের জন্মে মরেছিলে তো। সব যে দিব্বি ভুলে মেরে দিয়েছ দেখছি।"

রাধাকান্ত ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাতে তাকাতে বললেন, "আ-আ-আমার কি-কি-কিচ্ছু মনে পড়ছে না।"

"তাতে কী। আমি সব মনে করিয়ে দিচ্ছি। আগের জন্মে তুমি ছিলে কৃষ্ণকান্তবাবু। বুঝলে তো?"

রাধাকান্ত সুবোধ ছেলের মতো বললেন, "হ্যাঁ।"

ভূতটা যেন ভূগোলের মাস্টারমশাই। সে বোঝাতে লাগল, "সে জন্মে তুমি অনেক পুণ্য করেছিলে। কিন্তু মস্ত একটা পাপও করেছিলে—বুঝেছ?"

"কী পাপ?" রাধাকান্তর মোটা মাথায় ব্যাপারটা যেন ঢুকছে না।

"একদিন তুমি তোমার ছোট ছেলের হাত থেকে মিঠাই কেড়ে খেয়েছিলে। সে কেঁদে উঠলে তার গালে জোরসে একটা থাপ্পড় মেরেছিলে। এবার বুঝেছ?"

রাধাকান্ত কী যে বুঝলেন কে জানে। শুধু হাবার মতো জিজ্ঞেস করলেন, "তাতে কী হল?"

ভূতটার খুব ঠাণ্ডা মাথা নিশ্চয়ই। একটুও বিরক্ত না হয়ে সে বলল, "যা হবার তাই হল। বুড়ো বয়সে তুমি মারা যাবার পর যমরাজ বিচার করে বললেন, তোমার অর্ধেক পাপ, অর্ধেক পুণ্য। কোনটার ফল আগে ভোগ করতে চাও? তুমি তখন কী উত্তর দিয়েছিলে মনে আছে?"

রাধাকান্ত হাঁদার মতো মাথা নেড়ে বললেন,

"না তো।"

"তা থাকবে কেন। তখনই তো সর্বনাশটি করেছ তুমি।" বলতে বলতে হঠাৎ ভীষণ খেপে গেল ভূতটা। চোখগুলো ভাঁটার মতো গোল করে, দাঁতগুলো ঝাঁটার মতো বার করে বলল, "তুমি তখন বললে কি না—দুটোই একসঙ্গে ভোগ করব। বলিহারি বুদ্ধি তোমার। অমনি যমরাজও বললেন, 'তথাস্তু।' অর্ধেক পুণ্য করার জন্যে তোমার আধখানা বড়লোকের বাড়িতে মানুষ হয়ে জন্মাক। আর অর্ধেক পাপের জন্য বাকি আধখানা ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াক।"

"বাহ্—বেশ ভাল বিচার তো।"

রাধাকান্ত এতক্ষণে যেন একটু চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। কিন্তু তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই ভূতটা বেজায় দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠল। ভেংচি কেটে বলল, "তা তো বলবেই। নিজে দিব্বি দুবেলা মাংস-পোলাও খেয়ে ভুঁড়ি বাগাচ্ছ কি না। আর আমি বেচারা এদিকে দিন-দিন উপোস দিয়ে চিমসে হয়ে যাচ্ছি। পেটুক, স্বার্থপর কোথাকার। এবার আর ছাড়ছি না তোমাকে।"

যেখানেই যান, যে-কাজই করুন
স্বাচ্ছন্দ্যময় চলা-হাঁটার উপরই
নির্ভর করছে আপনার সাফল্য।

রাজুর তৈরী টেকসই গেঞ্জী, জাঙ্গিয়া,
মোজাই আপনাকে জোগাতে পারে
সেই বাড়তি স্বাচ্ছন্দ্য, এবং কম
খরচে। কেনার সময় খোঁজ করবেন—

১। প্রেসটিজ রঙীন জাঙিয়া
২। রঙীন ড্রয়ার্স
৩। ডাক্কর জাঙিয়া
৪। ফেদার-ফিট রিব গেঞ্জী
৫। ইজিপসিয়ান গেঞ্জী
৬। কুলফিল গেঞ্জী

গেঞ্জী জাঙ্গিয়া
মোজার রাজা

RAJU

ভয় ভেঙে গিয়ে রাধাকান্ত এবার সোজা হয়ে বসেছেন। ভরা পেটটাও একটু হালকা লাগছে এখন। খোশমেজাজে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ছাড়বে না মানে? আমার ঘাড় মটকাবে নাকি?"

কথাগুলো বোধহয় ভূতের কানেই গেল না। সে ঝোঁকের মাথায় বলে যেতে লাগল, "তোমার সঙ্গে জায়গা বদলাবদলি করে নেব এবার। তুমি আমার জায়গায় ভূত সেজে ঘুরে বেড়াবে, আর তোমার জায়গায় আমি বাবু সেজে নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়াব।"

"আমার বয়ে গেছে।" বলতে বলতে রাধাকান্ত মস্ত একটা হাই তুলে রক থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হেলতে-দুলতে সোজা বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন।

কিন্তু ভূতটাও ভারী নাছোড়বান্দা। রাধাকান্তবাবুর পেছন-পেছন লম্বা-লম্বা পা ফেলে সেও এগোতে লাগল আর সমানে বলতে লাগল, "কী হল? চললে যে? আমার কথাটা পছন্দ হল না বুঝি? ওহে রাধাকান্তবাবু— ও আধাকান্তবাবু, শুনছ?"

কে শোনে কার কথা। রাধাকান্ত যেন কানে তুলো গুঁজে হাঁটছেন। একবারও ফিরে তাকাচ্ছেন না। ভূতটা তখন পেছন থেকে ভয় দেখাতে লাগল, "তোমার সব টাকাকড়ির অর্ধেক ভাগ আমার, মনে থাকে যেন।"

রাধাকান্তবাবু তেমনি নিজের মনে হাঁটছেন তো হাঁটছেনই। ভূতটা এবার বলতে লাগল, "তোমার নামে কোর্টে মামলা করব কিন্তু। আমার ভাগ আদায় করে ছাড়ব।"

তবু রাধাকান্ত পেছন ফিরে তাকান না যে। আচ্ছা অদ্ভুত লোক তো। ভূতটা শেষকালে কেঁদে-কেটে আছড়ে পড়ল রাধাকান্তবাবুর সামনে। হাউ-মাউ করে বলল, "আচ্ছা, আমার খিদে পায় না বুঝি? কতদিন খাইনি বলো তো। একটু কিছু খেতে-টেতেও দেবে না?"

এবার কী আর করেন রাধাকান্তবাবু। হাজার হোক, নিজেরই আধখানা ভূত তো! নেমন্তন্ন খেতে বসে পাত থেকে গোটা পাঁচেক সন্দেশ লুকিয়ে বাঁ পকেটে পুরেছিলেন সকালে টিফিন খাবেন বলে। শেষকালে সেগুলোই তাকে পকেট থেকে বার করে দিলেন।

ছবি দেবাশিস দেব

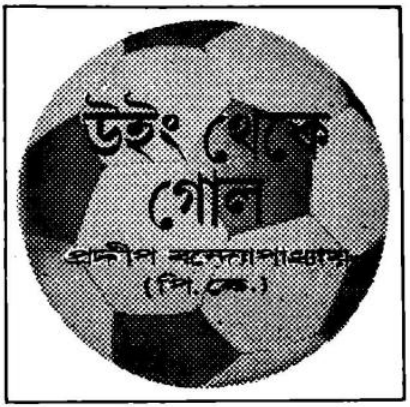

॥ ৩৪ ॥

কোনো সন্দেহ নেই, মোহনবাগানের সমর ব্যানার্জির পেনাল্‌টি শট বাঁচিয়ে প্রদ্যোত বর্মন আমাদের লীগচ্যাম্পিয়নশিপের কাছাকাছি এনে দিলেন। কিন্তু তখনও ন'টা ম্যাচ বাকি। এবং স্নায়ুর চাপ কাকে বলে, আমরা হাড়ে-হাড়ে বুঝতে শুরু করলাম।

মহমেডান স্পোর্টিং দারুণ খেলেও আমাদের কাছে হেরে গেল। প্রথমে আবিদ গোল করলেন। সেই গোল শোধ করলেন অসীম সোম। ফ্রী কিক থেকে দ্বিতীয় গোল করলাম আমি।

সালাউদ্দিন মহমেডানের পক্ষে আর-একবার গোল করলেন, কিন্তু বল জালে জড়ানোর আগেই খেলা-শেষের বাঁশি বেজে গিয়েছিল।

এর পর এরিয়ানকে আমরা হারালাম ২-০ গোলে। ফ্রী কিক থেকে তাপস সোম আলতো টোকায় বল ঠেলেছিলেন, আমার বাঁ পায়ের শট এরিয়ানের গোলকীপার বি রাওকে হার মানিয়ে গোলে ঢুকল। দ্বিতীয় গোলটা এল দ্বিতীয়ার্ধে। চল্লিশ গজ দূরে বল পেয়ে তিন-চারজনকে কাটিয়ে গোলের কাছে এসে শট নিলাম। বি রাও ঘুষি মেরে বল ফেরালেন, কিন্তু বল ফিরে এল আমারই মাথায়। আমার হেড গোলে ঢুকতেই আমাদের জয় নিশ্চিত হয়ে গেল।

কিন্তু আগেই বলেছি, শেষের দিকের ম্যাচগুলোয় আমরা খুব স্নায়ুর চাপে ভুগছিলাম। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল আর মহমেডান স্পোর্টিংয়ের পর চতুর্থ ভারতীয় দল হিসেবে আমরা লীগ পেতে চলেছি, এই উত্তেজনাই যেন আমাদের পেয়ে বসেছিল। বাঘাদা সবসময় বলতেন, শেষ সময়ে মাথা ঠাণ্ডা রেখে লক্ষ্যের দিকে না এগোলে, এমন সোনার সুযোগ চিরকালের মতো হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। অবশ্য, এ-ব্যাপারে আর-একজন দারুণ ভূমিকা নিয়েছিলেন—আমাদের টীমের ক্যাপ্টেন প্রমথরঞ্জন (বুড়ন) বসু। শিক্ষিত এবং মার্জিতরুচি বুড়নদা জানতেন, কী করে তরুণ খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করতে হয়। নিজে খুব ছিমছাম ফুটবল খেলতেন। এবং চাইতেন, অন্যরাও সেইরকমই খেলুক।

স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জিততেও আমাদের হিমশিম খেতে হল। দ্বিতীয়ার্ধে মিনিট পাঁচেক খেলা গড়ানোর পর ডান দিক থেকে তাপস সোমের তুলে-দেওয়া বলে হেড নিয়ে একমাত্র গোলটি আমিই করলাম।

বালি প্রতিভার সঙ্গে খেলায় একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটল। এই ম্যাচেও আমরা ভাল খেলতে পারছিলাম না। অন্য বড় দলগুলোর বেশ কিছু সমর্থক তখন মাঠে আসতেন, ইস্টার্ন রেলওয়ের প্রতিপক্ষ দলকে সোচ্চার সমর্থন জানাতে। বালি প্রতিভার ডিফেণ্ডাররা সেদিন দারুণ লড়ছিলেন। একটি বড় দলের সমর্থকরা হঠাৎ ওদের সমর্থন করার সঙ্গে-সঙ্গে ইস্টার্ন রেলের ফরোয়ার্ডদের

পি বসু (লীগ চ্যাম্পিয়ন রেলওয়ে স্পোর্টসের ক্যাপ্টেন)

আশাপূর্ণা দেবী
এবং
অসাধারণ দুটি উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী 'রাজকুমারের পোশাকে' উপন্যাসে প্রায় একালের এক আরব্য-উপন্যাসের গল্প শুনিয়েছেন। তেমনই ঝলমলে এবং বর্ণময়। অথচ যাকে নিয়ে এই গল্প, সে নিতান্তই এক মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। হঠাৎই সেই ছেলেটি কী করে হিঙুলগঞ্জের 'ছোট রাজাবাবু' হয়ে উঠল, কীভাবেই বা ফের বদলে গেল তার জীবন—তাই নিয়েই এই আকর্ষণীয় উপন্যাস। আরেকটি উপন্যাস 'গজ উকিলের হত্যা-রহস্য।' রহস্য, তবু দারুণ মজাদার সেই রহস্য। এই উপন্যাস একাধারে রসঘন ও রহস্যঘন, কৌতূহলকর ও কৌতুকমুখর, উত্তেজনায় ভরা ও উল্লাসে ঠাসা।

আশাপূর্ণা দেবীর বই

রাজকুমারের পোশাকে ৫·০০
গজউকিলের হত্যা-রহস্য ৮·০০

আরো অনেক বই

বিমল করের ওআওার মামা ৭·০০ কাপালিকরা এখনও আছে ৮·০০ রাজবাড়ির ছোরা ও হারানো জীপের রহস্য ১২·০০ অলৌকিক ১০·০০ মনোজ বসুর ওস্তাদ নটবর ৬·০০ শিশির করের গঙ্গায় বাঘ ৪·০০ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও বিমল দাশের সাদা বাঘ ১০·০০ শিবরাম চক্রবর্তীর লাভের বেলায় ঘণ্টা ৮·০০ শেখর বসুর সোনার বিস্কুট ৮·০০ লীলা মজুমদারের বাতাসবাড়ি ৫·০০ কাগ নয় ১০·০০ সমরজিৎ করের অগ্রজ বিজ্ঞানী ১৫·০০ অমরনাথ রায়ের দেশ বিদেশের বিজ্ঞানী ১২·০০ আশাপূর্ণা দেবীর রাজকুমারের পোশাকে ৫·০০ গজ উকিলের হত্যা-রহস্য ৮·০০ সমরেশ বসুর মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৬·০০ বন্ধ ঘরের আওয়াজ ১০·০০।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯ ফোন ৩৪ ৪৩৬২

১৯৫৮ সালের লীগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব

গালাগালি দিতে শুরু করলেন। আমিই প্রধান টার্গেট। মাথায় হঠাৎ রক্ত চড়ে গেল। নিজের ওপর সবরকম নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম খানিকের জন্য। ঐ গালাগালি-দেওয়া দর্শকদের উদ্দেশে নিজের বুট খুলে দেখলাম।

এই একটি ঘটনা বা দুর্ঘটনাই তখন ঝড় তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। রেফারী নৃসিংহ চ্যাটার্জি কঠোরভাবে ভৎর্সনা করলেন। পরদিন খবরের কাগজে এক বিখ্যাত সাংবাদিক অনেকখানি জায়গা জুড়ে আমার আচরণের তীব্র সমালোচনা করলেন। বছরের সেরা ফুটবলারের সম্মান এই কারণেই হাতছাড়া হয়ে গেল। ভেটারেন্স ক্লাবের দেওয়া ঐ সম্মান শেষ পর্যন্ত আমি পেয়েছি উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে।

কোনো সন্দেহ নেই, বুট খুলে দেখিয়ে আমি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছিলাম। কিন্তু, আমারও তো কিছু বলার ছিল। কিছু বলার রেওয়াজ তখন ছিল না। আর ফুটবলারদের হয়ে কথা বলার মতো সাংবাদিকও তখন ছিলেন না।

শেষ ম্যাচ জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে ড্র করলেই আমরা চ্যাম্পিয়ন। ইসবেঙ্গল আমাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় লীগম্যাচে খেলবে না, জানিয়ে দিয়েছিল।

জর্জের বিরুদ্ধে খেলায় প্রথমার্ধে গোলের দু'টি সহজ সুযোগ নষ্ট করলেন সুযোগসন্ধানী দিনু দাস। দ্বিতীয়বার দেখা গেল, তিনি মাটিতেই শুয়ে আছেন। কাছে গিয়ে দেখি, দিনুর চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে। পরে জানা গেল, দিনু তিন দিন কিছু খাননি। এক নিকট-আত্মীয় ওঁদের সর্বস্বান্ত করে চলে গেছেন।

কে কে দাস বললেন, "তোমরা বেশি চিন্তা কোরো না। কিছু একটা ব্যবস্থা করা হবে।"

দিনু দাস ছিলেন দারুণ মাথা-উঁচু মানুষ। সাহায্যের প্রস্তাবে সাড়া দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবু সকলের অনুরোধ এবং কে কে দাসের চেষ্টায় আমরা একটা প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে কিছু টাকা তুলে দিলাম। খেলার পর প্রত্যেক খেলোয়াড়কে গাড়ি-ভাড়া হিসেবে কুড়ি টাকা করে দিয়ে বাকি টাকাটা দিনুর হাতে তুলে দেওয়া হল। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। তাপস সোম উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এই কুড়ি টাকাও আমরা নেব না, তাহলে আরও কিছু টাকা দিনু পেতে পারে।

চোখের জল মুছতে মুছতে দিনু দাস বললেন, "তোরা শুধু আমার টীমের প্লেয়ার না, তোরা আমার ভাই।"

হ্যাঁ, আমরা সকলে ভাইয়ের মতোই ছিলাম তখন। শেষ ম্যাচে জর্জ টেলিগ্রাফকে ২-১ গোলে হারিয়ে লীগের সোনার হরিণ হাতে পেলাম। দুটি গোলই করলেন সুবীর রায়।

আনন্দ, আনন্দ, প্রচণ্ড আনন্দে আমরা আত্মহারা হলাম। তবু তারই মধ্যে এক গভীর শূন্যতা আমাকে ঘিরে ফেলল। শুনলাম, ইস্টার্ন রেল ক্লাবই আমাকে সাসপেণ্ড করতে পারে!

(ক্রমশ)

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

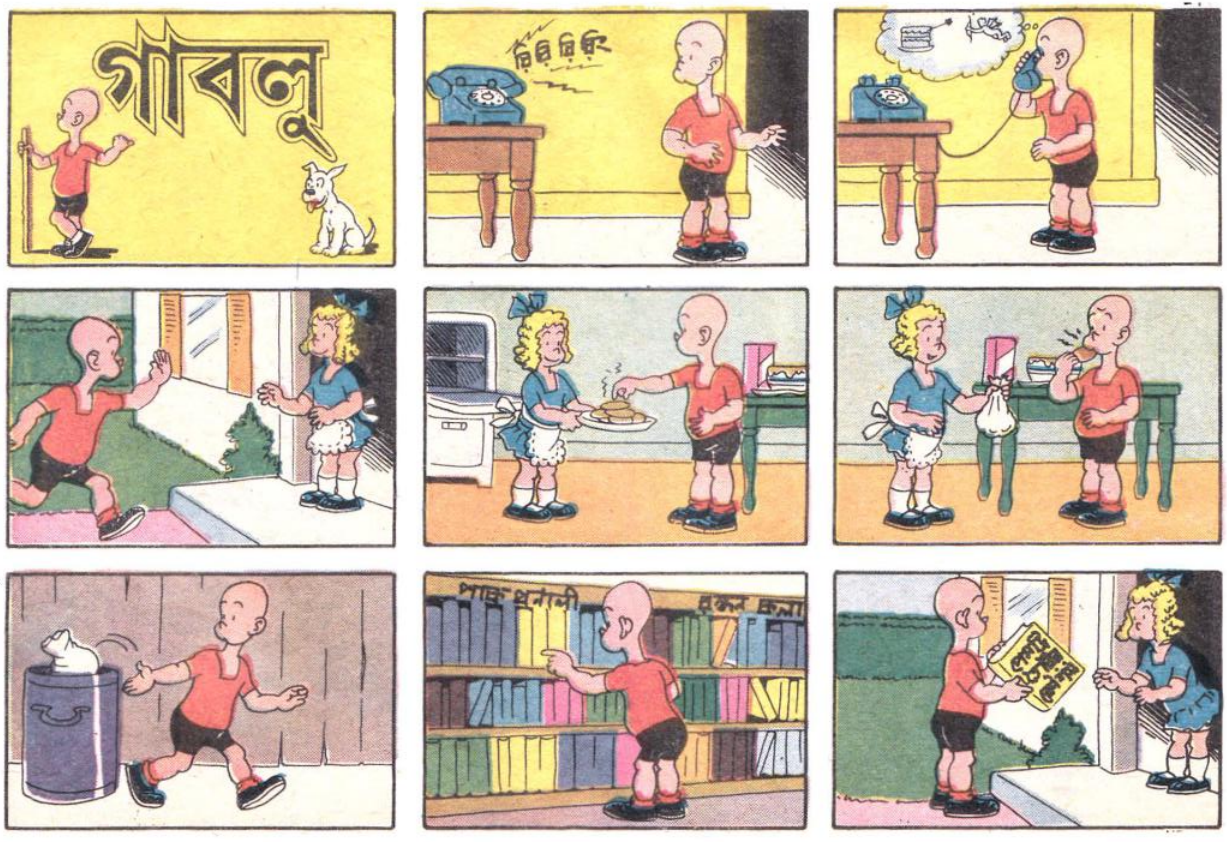

গাবলু
পাক প্রণালী
রন্ধন কলা

অ-এর উঁচু নজর

বাচস্পতি

"শব্দের মধ্যে পরে যদি 'ই' বা 'উ' থাকে তাহলে অ একটা লাফ দিয়ে এক ধাপ উঠে ও হয়ে বসছে, তা তো আগেই বলেছি।" হিগিনকাকু বলতে লাগলেন, "সেটা মোটামুটি সবাই জানি। ইচ্ছেমতো উদাহরণ নাও-না।" বাবার দিকে আঙুল তুললেন। এমন সময় ধোঁওয়া উঠতে থাকা কালো কফি এসে পড়ায় তাঁর মুখের মাস্টারি চেহারাটা একটু কোমল হয়ে উল্লাসের চাপা আভা দেখা দিল। রাধার হাত থেকে কাপটা প্রায় কেড়ে নিয়ে সুড়ুত করে চুমুক দিয়ে চটপট চোখ বুজে ফেললেন—সেটা আরামে না গরমের জন্যে, ঠিক বোঝা গেল না। তারপর আবার শুরু করলেন, "দ্যাখো, লক্ষ করো, পশ্য, নোটিস, রেমার্কে ভু ইত্যাদি ইত্যাদি—আমি প্রথমে এমন শব্দ বলছি যেখানে ঐ 'অ' অ-ই আছে; তার পাশে আবার এমন একটা শব্দ বলছি যেখানে 'অ' আর 'অ' নেই, 'ও' হয়ে গেছে। ক্যান্ কও তো রে বাপু—" বলে ভন্টুর দিকে আবার আঙুল উঁচিয়ে ধরলেন।

ভন্টু ভয়ে ভয়ে বলল, "এ-শব্দটায় অ-র পরে 'ই' বা 'উ' রয়েছে বলেই কি?"

"আলবাত।" বলে ভন্টুরই হাঁটু চাপড়ে দিলেন হিগিনকাকু। "এখন শব্দগুলো দ্যাখো

ঘট	ঘটি	(ঘোটি = ঘ্+ও+ট্+ই
নদ	নদী	(নোদি = ন্+ও+দ্+ই)
কটা	কটু	(কোটু)
বন্ধ	বন্ধু	(বোন্ধু)
সৎ	সতিন	(শোতিন)
বর	বরুণ	(বোরুণ)
চখা	চখী	(চোখি)
সঙ্গ	সঙ্গী	(শোঙ্গি)

প্রথম যে-শব্দগুলো বলছি, লক্ষ করো, তাতে অ-এর পরে যেখানে স্বরধ্বনি পাচ্ছি সেটা আর যাই হোক ই-উ অর্থাৎ [+ঊর্ধ্ব] নয়। আর পরের শব্দগুলো দ্যাখো, পরের সিলেব্‌লে 'ই' বা 'উ' থাকার ফলে 'অ'-এর কী দশা ঘটছে—সে সড়াত করে বিক্রমাদিত্যের বেতালের মতো ওপরে উঠে যাচ্ছে।"

"সে তো অনেকক্ষণ বুঝেছি," বাবা একটু অধৈর্য হয়ে বললেন, "কিন্তু এর কি কোনো ব্যতিক্রম নেই? সবক্ষেত্রে পরে [+ঊর্ধ্ব] স্বরধ্বনি থাকলেই আগের সিলেব্‌লের 'অ' 'ও' হবেই?"

ভন্টু বলল, "আরেকটা কথা। 'অ' শুধু এই একটা জায়গাতেই ওপরে উঠে 'ও' হয়? পরে ই-উ থাকলেই? অন্য কোথাও হয় না?"

"শাব্বাশ।" বলে হাততালি দিয়ে উঠলেন হিগিনকাকু। তারপর তলানিসুদ্ধ কফির কাপ মুখে উলটে দিলেন, পরে সেটি নামিয়ে বললেন, "এক নম্বর—শব্দের প্রথমে র-ফলাওয়ালা ব্যঞ্জন-এর পরে যে 'নিহিত' অ, সেটা সবসময় ও হবে। যেমন 'প্রথম' হল 'প্রোথম', 'শ্রম' হল 'শ্রোম', 'ব্রত' হল 'ব্রোতো', 'ত্রস্ত' হল 'ত্রোস্তো'—আঃ, এবার তোমরা বলো।" বলে অস্থির তুড়ি দিতে লাগলেন হিগিনকাকু।

বাবা বলতে লাগলেন, "প্রসাদ, শ্রবণ, গ্রহণ, দ্রবণ, ভ্রমণ..."

(ক্রমশ)

আনন্দের খবর

প্রসাদ

আজ চামেলির খুব আনন্দ। ইস্কুল থেকে ফিরেই দেখে একটা দারুণ খবর এসেছে। পিসিমা আর পিসেমশাই দু দিন পরেই এসে পৌছচ্ছেন মণিকে নিয়ে। মণি মানে মণিমালা, আমাদের শ্রীমতী চামেলির পিসতুতো বোন, আর কী যে বন্ধু, বলাই যায় না। থাকে অনেক দূরে, সেই কোন জলন্ধরে, অনেক দিন অন্তর কলকাতায় আসতে পায় বেচারি, কিন্তু যখন আসে তখন কী মজাই যে হয়, মিলি বলে শেষ করতে পারে না।

"Do you think they are going to stay long this time, Daddy?" asked Milly.

"The telegram doesn't say anything about that." Mr Roy said, "But if your uncle is coming on his annual furlough they should be able to stay at least a couple of weeks."

Chameli knows what a furlough is.

(If you wish to find out, will you look up a dictionary?)

Her uncle, Col.Biswas is an infantry officer.

Both Chameli and Chambal greatly admire him. Chambal hopes he will be able to join the army when he grows up and become an officer like him.

"And I hope it'll be the infantry for me, because the infantry is the most important branch of the army," Chambal says.

He has often heard his uncle say so. (I expect you'll want to look up the word "infantry" too in your dictionary.)

So you can easily understand that both the brother and the sister are eagerly looking forward to the arrival of Col.Biswas and his family on Tuesday.

"Are we going to station to bring them home, Daddy?" Milly asked.

"I suppose we'll have to," Daddy said. "Taxies can be very hard to come by at Howrah Station."

Chambal said, "I don't understand how taxies can be hardest to get when you need them most."

Mr. Roy admitted that he was unable to solve the mystery of the disapperaing taxi. Chameli suggested that they should start early for the station on Tuesday afternoon.

Daddy agreed that it would be wise to do so.

* * * * *

লক্ষ করো :

Do you think they are going to stay long?

Chambal hopes he will be able to join the army.

I expect you'll want to look up a dictionary.

I suppose we'll have to go.

It's easy to understand *that* they should look forward to this.

I don't understand how taxies can suddenly disappear.

Mr Roy admitted *that* he was unable to solve the mystery.

গাবলু
টুপির দোকান

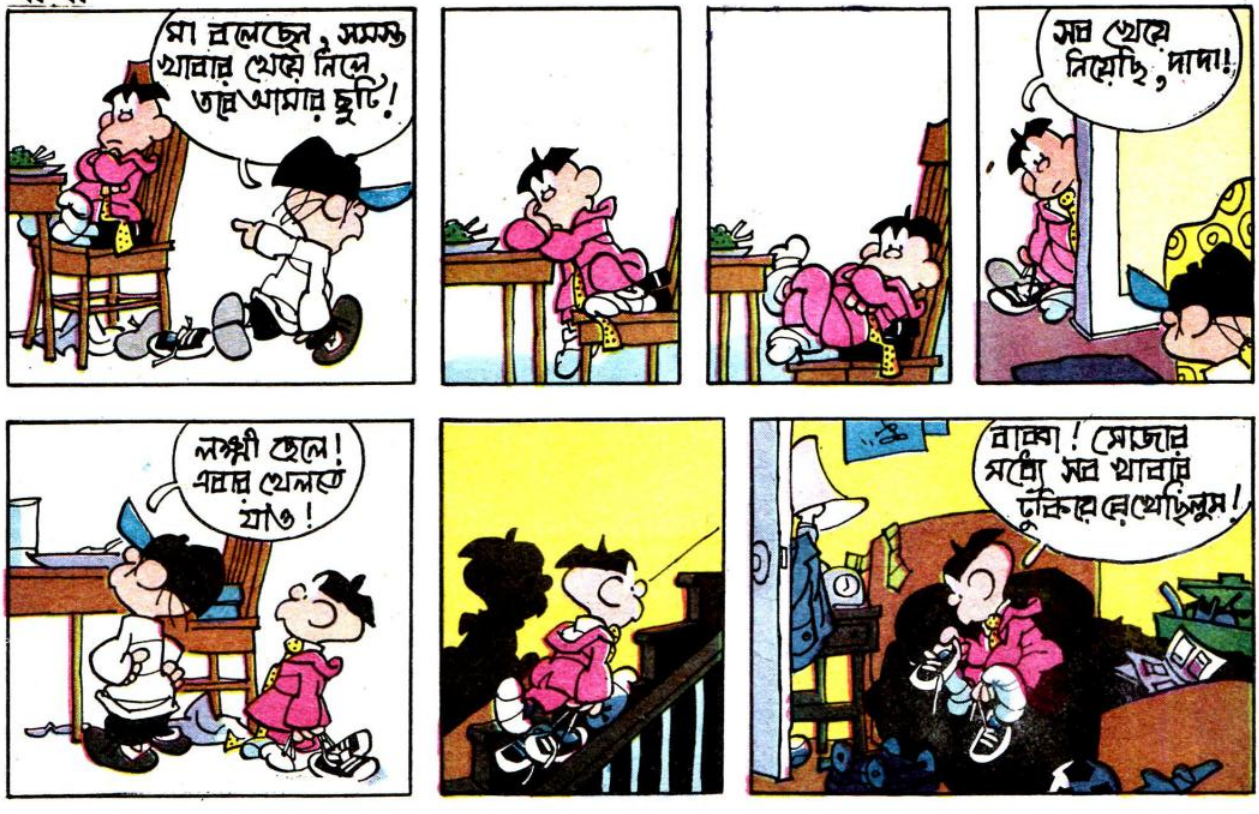
মা বলেছেন, সমস্ত খাবার খেয়ে নিলে তবে আমার ছুটি!
সব খেয়ে নিয়েছি, দাদা!
লক্ষ্মী ছেলে! এবার খেলতে যাও!
বাব্বা! সোজার সঙ্গে সব খাবার টেবিলে রেখেছিলুম!

আঁকো

ডিম থেকে পাখি

বেশ মনোযোগ দিয়ে দ্যাখো, ডিমগুলিকে পাখিদের চলাফেরার বিশেষ চরিত্র-মাফিক সাজিয়ে নিলেই তাদের মধ্যে পাখিদের ধরা যায়। নমুনায় লক্ষ করো, পাখিরা পাঁচিলে বসে কেমন গল্প করছে। সন্ধে বেলায় এদের তারে বসিয়ে দিলে চমৎকার দোল খাবে।

—রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

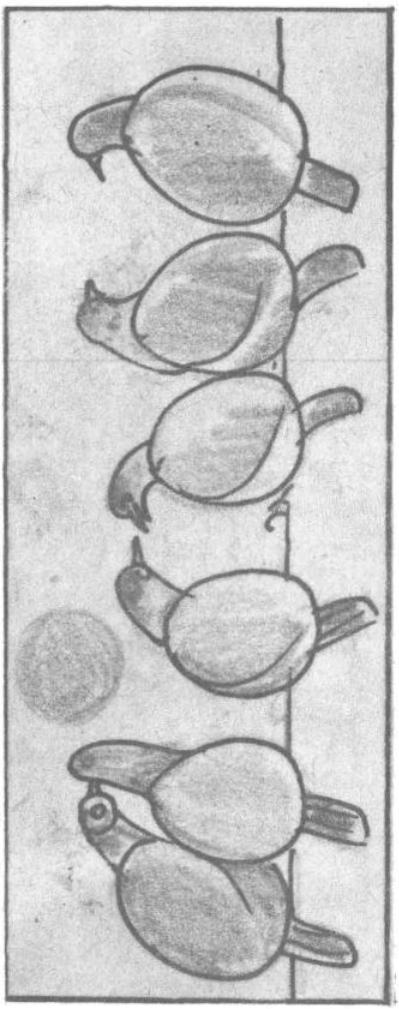

শেখো

কার্ডবোর্ডের কাজ : কাগজের বাক্স

তোমার দরকারমতো মাপের বাক্সের জন্যে একটা চৌকো বোর্ড নিয়ে তাকে সমান ৯ ভাগে ভাগ করে নাও।

এই ভাগের ২নং চৌকো দুটির ক-ক ও খ-খ অংশের কালো দাগ-বরাবর কাঁচি দিয়ে চিরে রাখো।

এবার অন্য সব চৌকোর যে-যে দিকে ফোঁটা-ফোঁটা দাগ আছে, তাকে ভাঁজ করার জন্যে চাপ দিয়ে দাগ দিয়ে ঠিকমতো পর-পর ভাঁজ দিয়ে মুড়ে আঠা দিয়ে সেঁটে দিলেই বাক্স তোমার হাতে।

জেনে রাখো— (১) আঠা সাবধানে না লাগালে দেখতে নোংরা হবে। (২) ভাঁজের সুবিধার জন্য আগের বাক্স তৈরির সময় যে-পদ্ধতি ব্যবহার করেছ এখানেও তাই হবে।

—কারিগর

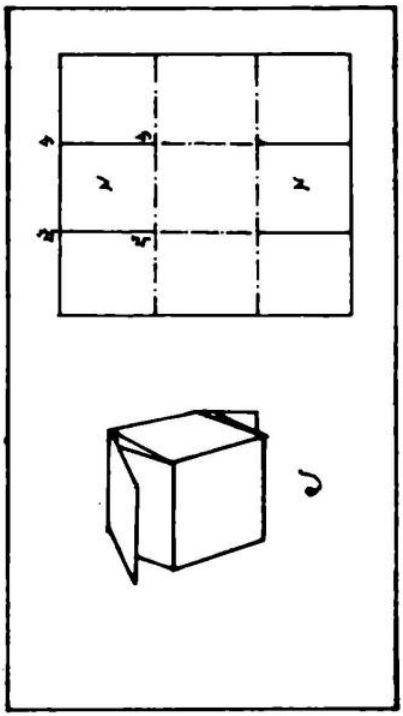

অতিথিকে চা দিই

সঙ্গে

ব্রিটানিয়া মারী!

মাণিক জোড়ঃ চুমুক চুমুক চায়ের সঙ্গে মচমচে
খাবার···ব্রিটানিয়া মারী বড় চমৎকার! পরিপাটির
অতিথি সৎকার··· ব্রিটানিয়া মারী করে দেদার!
চায়ের সঙ্গে হালকা খাবার···মারী বিস্কুটের
জুড়ি মেলা ভার!
সব সময় এক প্যাকেট কাছে রাখুন।

ব্রিটানিয়া

মারী

বিস্কুট

চায়ের সাথী মচমচে বিস্কুট

ব্রিটানিয়া

ব্রিটানিয়া বিস্কুট সবচেয়ে সেরা

লিনটাস-BIN.MRE.6-1812 BG

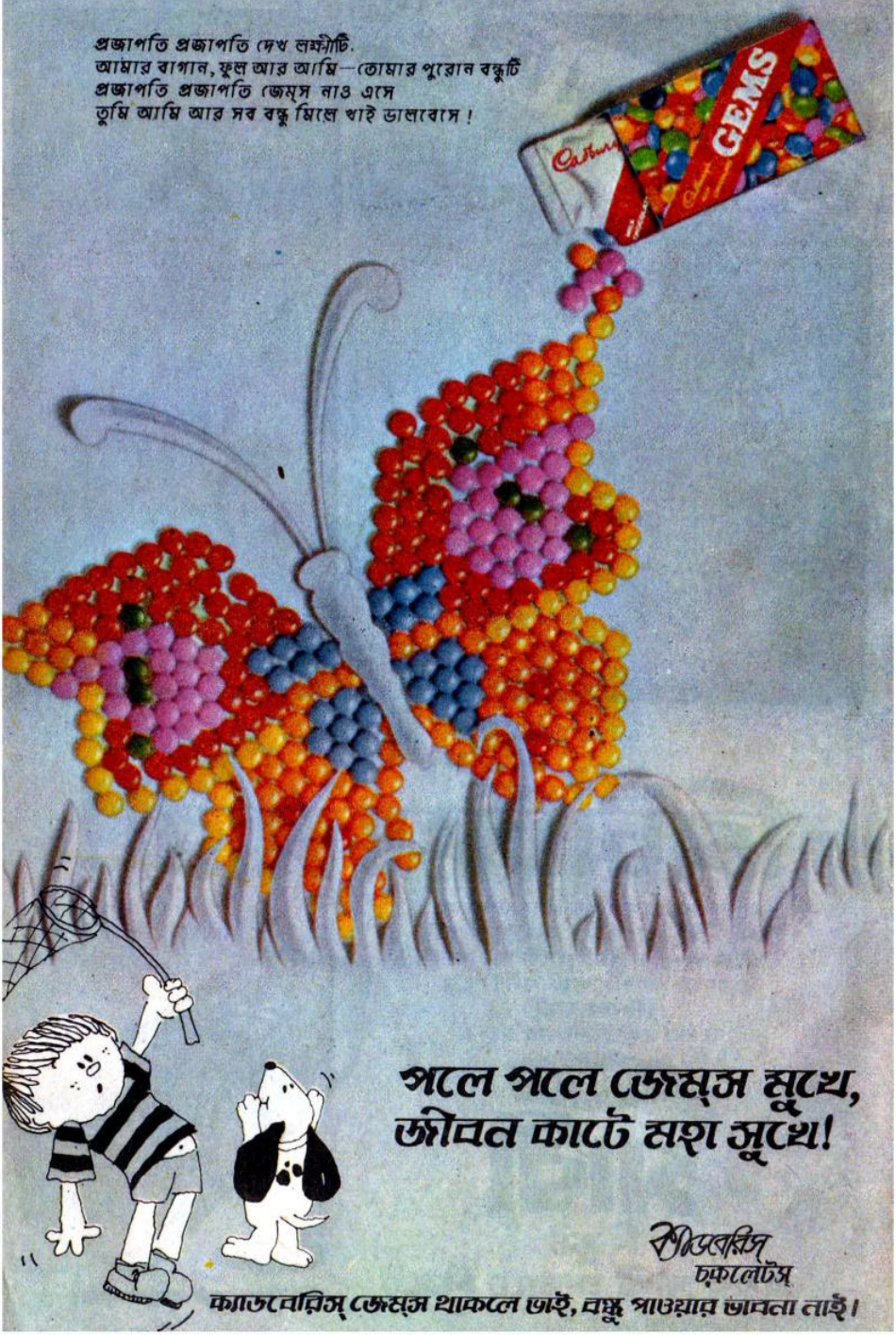
প্রজাপতি প্রজাপতি দেখ লক্ষীটি,
আমার বাগান, ফুল আর আমি—তোমার পুরোন বন্ধুটি
প্রজাপতি প্রজাপতি জেম্‌স নাও এসে
তুমি আমি আর সব বন্ধু মিলে খাই ভালবেসে !
GEMS
পলে পলে জেম্‌স মুখে,
জীবন কাটে মহা সুখে!
ক্যাডবেরিস্
চকলেটস্
ক্যাডবেরিস্ জেম্‌স থাকলে ভাই, বন্ধু পাওয়ার ভাবনা নাই।